রজনী

হুমায়ূন আহমেদ

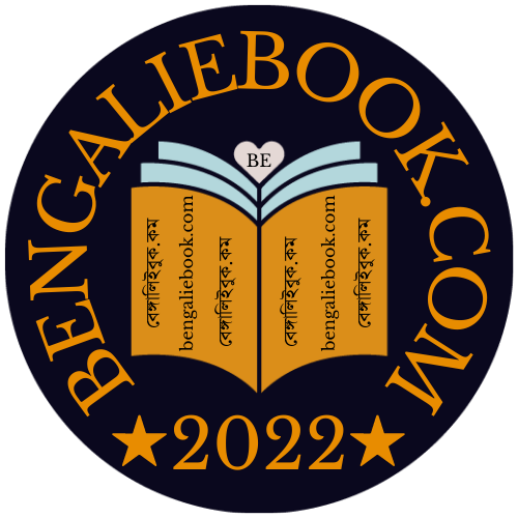

সূচিপত্র

১. বাবা খকখক করছেন 2
২. তের বছরের বালিকা বধূ 7
৩. ডাক্তারের সন্ধানে বের হলাম 11
৪. রিকশা যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত যাবে না 44
৫. হলে মন টিকল না 62
৬. রোদের তেজ মরে আসছে 66
৭. মাসুমের খোঁজে 75
৮. মাসুম মুখ লম্বা করে বসে আছে 81
৯. নিউমার্কেটে এশার সঙ্গে দেখা হল 104
১০. কবিতার বই চলছে কেমন 108
১১. দাঁড়িয়ে আছি একটা ক্লিনিকের সামনে 112
১২. চুপচাপ বসে আছি 113

১. বাবা খকখক করছেন

বাবা খকখক করছেন।

এই খকখক অন্যদিনের মতো নয়। আজকেরটা ভয়াবহ যেন তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করছেন ফুসফুসের খানিকটা অংশ কাশির সঙ্গে বের করে ফেলতে পারছেন না। আমি মনে মনে বললাম, আরে যন্ত্রণা! বলেই খানিকটা অনুশোচনা হল। যাকে বলে জন্মদাতা পিতা! বেচারা কাশতে কাশতে ফুসফুস বের করে ফেলছেন। এই সময় সহানুভূতিতে পুত্রের হৃদয় আর্দ্র হওয়া উচিত। হাওয়াটাওয়া করা উচিত কিংবা ছুটে যাওয়া উচিত একজন ডাক্তারের কাছে। তা করতে পারছি না, কারণ এখন বাজছে ছটা তিরিশ। আমি ঘুমুতে গেছি রাত তিনটায়। আমার পক্ষে মমতা দেখানো সম্ভব না। তবু দেখাতাম—দেখাচ্ছি না, কারণ, বাবার এই খকখক সাময়িক ব্যাপার, কিছুক্ষণের মধ্যে থেমে যাবে। আবার শুরু হবে রাতে ঘুমুতে যাবার আগে আগে। শিয়াল প্রহরে প্রহরে ডাকে, আমার বাবা ডাকেন সকালে এবং সন্ধ্যায়। বাকি সময়টা তিনি মোটামুটি সুস্থ।

আমি চাদর দিয়ে পুরোপুরি নিজেকে ঢেকে ফেললাম। মন থেকে সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূর করে ফেললাম। ঘুমটা আবার শুরু করা যায় কি না তার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা। সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। রাতের ঘুম ভাঙলে জোড়া লাগে, ভোরবেলারটা লাগে না।

বীরু, ওই বীরু।

মার গলা। মটকা মেরে পড়ে থাকলে কোন লাভ হবে না। মা কিছুক্ষণ গা ঝাঁকাবেন, টান দিয়ে চাদর ফেলে দেবেন, আদুরে গলায় ডাকাডাকি করতে থাকবেন। এবং ঘুম ভাঙানোর

জন্যে গায়ে মাথায় হাত বোলাবেন। একটা বিশেষ বয়সের পর পুত্ররা মার এই জাতীয় আদর খুব একটা পচ্ছন্দ করে না, কিন্তু আমার মা এই খবরটা জানেন না।

বীরু ও বীরু।

শুনছি। কি ব্যাপার?

তোর বাবার তো দম আটকে আসছে। শেষরাত থেকে কাশছে।

বল কী?

ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছে। তুই একটু যাবি?

কোথায় যাবো?

ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আয় না লক্ষ্মীসোনা!

মা আবার তার শুকনো হাত আমার বুকে-পিঠে বোলাতে লাগলেন। আমি বিরক্ত গলায় বললাম, সুড়সুড়ি দিও না মা, যাচ্ছি। চা দিতে বল, ঘুমটা কাটুক।

মা ছুটে গেলেন। এক্ষুনি কুৎসিত খানিকটা গরম জিনিস কাপে ঢেলে নিয়ে আসবেন। তার না আছে স্বাদ না আছে কিছু। জিনিসটা গরমও হবে না, আবার ঠাণ্ডাও না। অতিরিক্ত মিষ্টির জন্যে মুখে দেওয়া যাবে না এবং অবধারিতভাবেই দুধের সর ভাসবে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে মা চা বানাচ্ছেন—এখনো তিনি জিনিসটা শিখতে পারলেন না। শুধু চা কেন—

এই জীবনে তিনি কিছুই শিখতে পারেন নি। আমি যখন। ক্লাস ফোরে পড়ি, তখন সূচিকর্মে তাঁর প্রবল উৎসাহ দেখা গেল। অনেক রাত্রি জাগরণের পর কী একটা জিনিস যেন তৈরি হল। সেইটি গোপনে বাঁধিয়ে বসার ঘরে ঝোলানো হল—উদ্দেশ্য বাবাকে অবাক করে দেওয়া। বাবা সেই শিল্পকর্ম দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, এটা কি? মা ক্ষীণ গলায় বললেন, তাজমহল। বাবা আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার বাড়িতে তাজমহল কেন? আমি কি শাহজাহান? এক্ষুনি নামাও।

তাজমহল অবশ্যি নামানো হল না। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল—এই দুই কবির মাঝখানে তাজমহল হাইফেনের মতো বসে রইল। এখনো আছে, তবে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা নেই। একাত্তরের যুদ্ধের সময় বাবা রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দেন। নজরুলের ছবিটা এখনো আছে। ছবিটার দিকে তাকালে মনে হয় কবি নজরুল মুগ্ধ চোখে মার তৈরি তাজমহল দেখছেন। মার শিল্পকর্ম একজন বড় কবিকে মুগ্ধ করেছে, এটাই বা কম

কী? বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই আবার বাবা নতুন-উদ্যমে কাশি শুরুকরলেন। খকখক। খরখকখক খর। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা তালের ভাব আছে। এটাকে হয়তো ত্রিতাল কাশি বলা যাবে কিংবা কে জানে এটা হয়তো ঝাঁপতাল। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের কাশি সাধারণ মানুষদের মতো হবে কেন? একটু অন্যরকম হবে।

আমার বাবাকে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি বলা চলে। তাঁর ডিগ্রিগুলি এরকমবি এ (অনার্স), এম এ (ডাবল), এল এল বি। নানান ধরনের ডিগ্রি অর্জন ছাড়াও অন্যান্য প্রতিভার স্ফূরণও তাঁর মধ্যে দেখা গেছে যেমন কবিতা, নাটক এবং যন্ত্রসঙ্গীত। পড়াশোনা শেষ করবার পর চাকরিবারির মতো তুচ্ছ ব্যাপারে তাঁর কোনো আগ্রহ দেখা যায় নি। তিনি শিল্প-সাহিত্যের

চর্চায় উৎসাহী হয়ে ওঠেন। অতি অল্প সময়ে প্রায় হাজারখানেক কবিতা, দেড়টা নাটক এবং একটা পুরো উপন্যাস লিখে ফেলেন। নেত্রকোণায় আমার দাদাজানের আদি বাড়িতে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সাহিত্য আসর বসতে থাকে। গেটের কাছে একটা সাইনবোর্ড টানানো হয়—আলতা সাহিত্য বাসর। তাঁর গানের গলা না-থাকায় তিনি বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিয়ে প্রবল চেষ্টা চালান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তবলা এবং বেহালা। নেত্রকোণায় বেহালা শেখানোর মতো তেমন কোন শিক্ষক ছিলেন না বলে তবলার উপর চাপটা একটু বেশি পড়ে। গ্রীষ্মের দুপুরগুলিতে দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘামতে ঘামতে তিনি তবলায় বোল তুলতে থাকেন—তেরে কেটে ধিনতা। তেরে কেটে ধিনতা ধিনাক ধিনাক ধিন।

এই সময় তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ। টাকাপয়সা উপার্জনের মতো মামুলি বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় বা মানসিকতা কিছুই নেই। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা এইসব ছোটাখাটো ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে পারেন না। তাঁদের অনেক বড় জিনিস নিয়ে ভাবতে হয়। মহৎ চিন্তা করতে হয়। এইসব মহৎ জিনিস নিয়ে ভাবতে ভাবতে বাবা আরও একটি মহৎ কাজ করে ফেলেন। ত্রিশ বছর বয়সে তের বছরের এক বালিকার প্রেমে পড়ে যান। বাবার দেড় হাজার কবিতার প্রায় সব কটি এই বালিকাকে নিয়ে লেখা। এই বালিকার সঙ্গে বাবার বিয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বালিকাটি সরকারী হাসপাতালের এক হতদরিদ্র কম্পাউন্ডারের মেয়ে। কম্পাউডার সাহেবের বাঁ পা ডান পায়ের চেয়ে ইঞ্চিখানেক ছোট বলে নেংচে নেংচে হাঁটেন। তাঁর বহুল পরিচিত নাম হচ্ছে নেংড়া কম্পাউন্ডার। শারীরিক অসুবিধা ছাড়াও কম্পাউন্ডার সাহেবের আরো সব অসুবিধা ছিল। স্পিরিট এবং ধেনো মদ খেয়ে তিনি মাঝেমধ্যেই নেশা করতেন। নেত্রকোণার একটি বিশেষ পাড়ার সামনে তাঁকে সেজেগুজে প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উদাস নয়নে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা যেত।

আমার প্রেমিক-বাবা এইসব তুচ্ছ জ্ঞান করলেন এবং এক সন্ধ্যায় আমার দাদাকে গিয়ে বললেন, এই মেয়েটিকে বিয়ে না করতে পারলে তাঁর জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

দাদাজান একটি কথাও না-বলে বাবার বক্তব্য শুনলেন। ফরসি হুক্কায় টান দিতে দিতে পা নাচাতে লাগলেন। বাবার বয়ান শেষ হলে গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার মতো একজন জ্ঞানী মানুষের জীবন নষ্ট হওয়াটা কোনো কাজের কথা না। তোমার এত মূল্যবান জীবন বজায় থাকাই ভালো। যাও, বিবাহ কর। এবং বৌকে নিয়ে ঢাকায় গিয়ে থাক। ভয় নেই, চাল-ডাল, মশলাপাতি এখান থেকে পাঠাব। মাসে মাসে হাতখরচও পাবে। তবে আমি যত দিন জীবিত আছি, ততদিন তুমি এবং তোমার বৌ কেউই আমার সামনে পড়বে না। এখন আমার সামনে থেকে বিদায় হও।

২. তের বছরের বালিকা বধূ

বাবার সেই তের বছরের বালিকা বধূই আমার মা। বাবার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, কারণ বাবার বিয়ের পরপরই দাদাজান মারা যান। দাদাজানের বিশাল সম্পত্তি তাঁর হাতে এসে পড়ে। ধানী জমি, ভাটি অঞ্চলের জমি, নেত্রকোণা শহরে দুটি বাড়ি, ময়মনসিংহ শহরে একটি বাড়ি, একটা রাইস মিল এবং ইটের ভাটা। আমার প্রতিভাবান বাবা পাঁচ বছরের মধ্যে একটা ভেলকি দেখিয়ে দিলেন। তিনটি পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন এবং পুরোপুরি নিঃস্ব হয়ে ঢাকায় চলে এলেন।

বর্তমানে তিনি একটি ভাড়াবাড়িতে থাকেন। ডেলটা ইসুরেন্স কোম্পানির হেড ক্যাশিয়ার হিসেবে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন পান। বাড়িভাড়া হিসেবে পান সতের শ টাকা। মেডিক্যাল এলাউন্স এক শ। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা একেবারে জলে যায় নি। মাঝেমাঝেই খুব তেজী ভাষায় পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্র লেখেন। গত রোববারের আগের রোববারে ইত্তেফাকে তাঁর একটা চিঠি ছাপা হয়েছে। চিঠির বিষয়বস্তু হচ্ছে ঢাকা শহরে মশার উপদ্রব। কঠিন ভাষা। ভাগ্যিস মশারা পড়তে জানে না। জানলে এই চিঠি পড়েই তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত। বারান্দায় দাঁড়িয়েই আমার প্রতিভাবান বাবাকে একঝলক দেখা গেল। তিনি দরজা পর্যন্ত এসে ক্ষীণ গলায় পারুলকে কী সব বলে আবার বিছানায় চলে গেলেন।

পারুল আমার ছোট বোন। ভাই এবং বোনদের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক থাকে। বলে শুনেছি। আমাদের তা নেই। পারতপক্ষে আমরা দুজন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলি না।

সে আমাকে দেখলেই মুখ কুঁচকে ফেলে। কীটপতঙ্গ দেখলে আহলাদী মেয়েগুলো যেমন করে, অনেকটা সেরকম।

পারুল বাবার ঘর থেকে বের হয়ে থমকে দাঁড়াল। শুকনো গলায় বলল, একটা চিঠি এসেছে, টেবিলের উপর আছে। ভাব বাচ্যে কথা। তাও আমার দিকে না তাকিয়ে। যেন দেয়ালের সঙ্গে কথা বলছে। আমি বললাম, চিঠিটা কবে এসেছে?

গতকাল।

এখন দিচ্ছিস কেন?

দেবটা কখন? তুই ফিরেছিস রাত সাড়ে বারটায়। আমি রাত সাড়ে বারটা পর্যন্ত চিঠি কোলে নিয়ে বসে থাকব?

এমন বিশ্রীভাবে পারুল কথা বলল যে, আমার ইচ্ছা করল বালতি থেকে এক মগ পানি এনে ওর মুখে ঢেলে দিই। গলাটা সে এমন করেছে যে, কথাগুলো শোনাচ্ছে বাবার কাশির মতো। অথচ তার গলার স্বর বেশ ভালোই।

আমাদের এ-বাসায় পারুলের কারণেই কিছু যুবকের আনাগোনা আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে মিষ্টি একটা গলার স্বর বের করে। সব মেয়েদের স্টকেই বেশ কয়েকরকম গলার স্বর আছে বলে আমার ধারণা। একেক সময় এককটা বার করে। আমার এই বোনটাকে মোটামুটি চলনসই সুন্দরী বলা চলে। তবে সে যতটা না সুন্দর, তার নিজের ধারণা সে তার চেয়েও সুন্দর। এটাই হচ্ছে প্রধান সমস্যা। বিয়ের যেসব প্রস্তাব আসছে

তার কোনোটাই তার মনে ধরছে না। ব্যাংকের ম্যানেজারের এক প্রস্তাব এসেছিল। ছেলে দেখতে ভালো। সামান্য বেঁটে, তবে তেমন কিছু না। কথাবার্তা অনেক দূর এগনোর পর পারুল বলল, আমি বারহাট্টার এক গ্রামে পড়ে থাকব। তাই তোমরা চাও? সারাটা জীবন কাটালাম ঢাকা শহরে।

আমার মা হাসিমুখে বললেন, গ্রামই তো ভালো, নিরিবিলি থাকবি! টাটকা শাকসবজি খাবি। পারুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার টাটকা শাকসবজির দরকার নেই।

বাবা দরাজ গলায় বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, বাদ দাও। আরো দেখি?

তারপর একজন পাওয়া গেল ঢাকা শহরের। নওয়াবপুরে তার একটা ইলেকট্রিকের দোকান আছে। পুরনো ঢাকায় নিজেদের এজমালি বাড়ি। পারুল সব শুনে থমথমে গলায় বলল, শেষ পর্যন্ত আমি দোকানদার বিয়ে করব?

মা বললেন, দোকানদার খারাপ কিরে? দোকানদার তো ভালেই। স্বাধীন ব্যবসা। আমাদের রসুলুল্লাহ্ তো ব্যবসা করতেন।

পারুল রাগী গলায় বলল, তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলবে না তো মা! দেশে কি ডাক্তার-ইনজিনিয়ার নেই যে, আমাকে দোকানদার বিয়ে করতে হবে?

এরপর থেকে আমরা ডাক্তার এবং ইনজিনিয়ার খুঁজছি। আমরা মানে আমার বাবা। তিনি নিয়মিত আমাদের সব আত্মীয়কে চিঠি ছাড়ছেন। প্রতিটি চিঠির ভাষা ও বক্তব্য এক—পর সমাচার এই যে, আমরা কুশলে আছি। দীর্ঘদিন আপনার কোনো পত্রাদি না পাইয়া চিন্তাযুক্ত

আছি। সত্বর পত্র মারফত চিন্তা দূর করিবেন। এখন আপনাদের নিকট আমার একটি আবদার। আমার কনিষ্ঠা কন্যাটিকে সুপাত্রে সমর্পণ করিতে চাই। আপনাদের সকলের সহযোগিতা ভিন্ন সম্ভব নহে। যেভাবেই হউক একটি পাত্রের সন্ধান দিবেন। পাত্র ডাক্তার বা ইনজিনিয়ার হইলে ভালো হয়। বাবার বেশিরভাগ চিঠিরই জবাব আসে না। তবে তাঁর ধৈর্য অপরিসীম। তিনি আবার লেখেন। কয়েকদিন পর আবার। প্রথম জীবনে তিনি রবার্ট ব্রুসের কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। শেষ বয়সে করেছেন। অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত দেখাচ্ছেন।

৩. ডাক্তারের সন্ধানে বের হলাম

ডাক্তারের সন্ধানে বের হলাম।

ডাক্তার হচ্ছেন আমাদের ধীরেন কাকু। দীর্ঘদিন এই পাড়ায় আছেন। উনিশ শ পয়ষট্টি সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর দলবল নিয়ে কোলকাতায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। সুবিধা করতে না পেরে আবার ফিরে এসেছেন। এখানেও সুবিধা করতে পারেন নি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের সমস্ত দুর্বলতা ধীরেন কাকুর আছে। তিনি আশেপাশের সবাইকে খুশি রাখতে চান। বেশিরভাগ সময়ই ভিজিট নেন না। ভিজিট দিতে গেলে তেলতেলে একটা হাসি দিয়ে বলেন, আরে, আপনার কাছে ভিজিট কি নেব? ভাই। ভাই হিসেবে বাস করছি, কী বলেন? ঠিক না? আপনার বিপদে আমি আপনাকে দেখব, আমার বিপদে আপনি দেখবেন আমাকে। হা হা হা।

উনিশ শ একাত্তুরে ধীরেন কাকুকে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে গেল। তখন আমাদের পাড়ার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হাজি আবদুল কাদের তাঁকে অনেক ঝামেলা করে ছুটিয়ে নিয়ে এলেন, এবং এক শুক্রবারে হাজি আবদুল কাদের ধীরেন কাকুকে মুসলমান বানিয়ে ফেললেন। নতুন মুসলমান ধীরেন কাকুর নাম হল মোহাম্মদ সুলায়মান। তিনি দাড়ি রাখলেন। চোখে সুরমা দেওয়া শিখলেন। মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে লাগলেন। একদিন বেশ ঘটা করে বাজার থেকে গরুর গোশত কিনে আনলেন। শান্তি কমিটির একটা মিছিল বের হল। সেখানেও টুপি মাথায় তাঁকে দেখা গেল। দেশ স্বাধীন হবার পর ধীরেন কাকু আবার হিন্দু হয়ে গেলেন। তবে দাড়ি ফেললেন না। দাড়িতে তাকে বেশ ভালো মানায়, কেমন ঋষি-ঋষি লাগে।

ধীরেন কাকুকে বাসায় পেলাম না। কলে গেছেন। তাঁর বড় মেয়ে অতসীদি বললেন, তুই বোস বীরু, বাবা এসে পড়বে। কার অসুখ?

পিতৃদেবের।

কী হয়েছে?

বক্কর-বক্কর করে কাশছে। মনে হচ্ছে লাংস ফুটো।

ছিঃ বীরু, বাবাকে নিয়ে কেউ এভাবে কথা বলে?

অতসীদি এত কোমলভাবে কথাগুলো বললেন যে, সত্যি-সত্যি আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। তিনি হয়তো খুব সাধারণভাবেই কথাগুলো বলেছেন। তাঁর চেহারা এবং গলার স্বরের জন্যেই সাধারণ কথাও অন্যরকম মনে হয়েছে। একজন স্নিগ্ধ চেহারার মেয়ের কর্কশ কথাও স্নিগ্ধ মনে হয়। অতসীদি এই ভোরেই গোসল সেরেছেন। তোয়ালে দিয়ে ভেজা চুল বাঁধা। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কিছুক্ষণ আগেই গাঢ় করে কাজল দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর কোনো কোনো মেয়েকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত করুণা করেন। চোখে জন্ম-কাজল পরিয়ে দেন।

বীরু চা খাবি?

খাব।

চিনি নেই কিন্তু। বিনা চিনিতে।

বিনা চিনিতেই খাব।

নিয়ে আসছি, তুই বসে থাক। এরকম করে পা নাচাবি না তো, দেখতে বিশ্রী লাগে।

আমি বসে থাকি। অনেক দিন পর আসছি ধীরেন কাকুর বাড়িতে। ছোটবেলায় খুব আসা হত। আমার মূল আকর্ষণ ছিল মিষ্টি। এই বাড়িতে এলেই অতসীদি বলতেন, হাতটা ধুয়ে আয়, সন্দেশ দেব। সাবান দিয়ে ভালো করে ধুবি, নয়তো দেব না।

অতসীদির ছোট আরো তিন বোন ছিল। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। ধীরেন কাকু একেকজনকে কলকাতায় নিয়ে ঝামেলা পার করে এসেছেন। শুধু বড়জনকে পারেন নি। অথচ বড়জনই বোনদের মধ্যে সবচে সুন্দর। আমার মতে পৃথিবীর সবচে সুন্দর মেয়ে। শৈশবে প্রায়ই ভাবতাম, বড় হয়ে অতসীদিকে বিয়ে করব।

কে জানে মনে মনে হয়তো এখনো ভাবি, নয়তো তাঁকে দেখে এমন অস্থির লাগবে কেন?

চায়ের কাপ এবং একটা পিরিচে কী যেন একটা খাবার নিয়ে অতসীদি ঢুকলেন। রেশমের মতো কোমল গলায় বললেন, একটু মোহনভোগ এনেছি, খেয়ে দেখ তো। মিষ্টি বেশি হয়ে গেছে, তবে খেতে খারাপ না।

মোহনভোগ লাগবে না, তুমি চা দাও।

তোর চোখ এমন লাল হয়ে আছে কেন রে?

চোখে আলতা দিয়েছি, এর জন্য লাল হয়েছে।

দিনদিন তোর কথাবার্তা খুব খারাপ হচ্ছে। গুণ্ডাপাণ্ডা হয়ে গেছিস। তোর সঙ্গে একটা ছেলে আসত নাটুকু নাম। ওদেখি খুব বদমাশ হয়েছে। মদদ খেয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে। ঐ দিন রিকশা করে আসছি। আমাকে পেছন থেকে দেখেছে, চিনতে পারে নি। খুব খারাপ একটা কথা বলেছে। আমি রিকশা থেকে নেমে বললাম, কী হচ্ছে রে টুকু? ওমি পালিয়ে গেল। ও করে কী এখন?

মেয়েদের হাত থেকে গলার হার, হ্যান্ডব্যাগ এইসব ছিনিয়ে নেয়।

তুই সবসময় এ রকম ঠাট্টা করিস কেন?

ঠাট্টা না। সত্যি কথা বলছি। ওর পেশা হচ্ছে ছিনতাই।

আমি অতসীদির হাতে হাত রাখলাম। কী রকম ঠাণ্ডা একটা হাত। ধবধবে ফর্সা। তাকালেই পবিত্র একটা ভাব হয়।

অতসীদি হাত সরিয়ে নিলেন না। অন্য কোনো মেয়ে হলে নিত। অতসীদি অন্য কোনো মেয়ে নয় বলেই সহজ গলায় বললেন, তোর হাত এরকম হয়েছে কেন? রগ-ওঠা হাত। বানরের থাবার মতো লাগছে।

মনে হয় বানর হয়ে যাচ্ছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা বানর থেকে মানুষ হয়েছিল, আমরা মানুষ থেকে বানর হয়ে ঋণ শোধ করছি।

সব সময় উল্টাপাল্টা কথা বলিস কেন? আচ্ছা শোন, টুকুর সঙ্গে তোর দেখা হয়?

হয় মাঝে-মাঝে।

একবার বলিস তো আমার কাছে আসতে। কী রকম ছোট্ট ছিল। সব সময় নাক দিয়ে সর্দি পড়ত।

আমি চায়ের কাপ নামিয়ে হঠাৎ করে বললাম, একটা মজার কথা শুনবে অতসীদি?

তোর তো সব কথাই মজার, নতুন করে আর মজার কথা কি শোনাবি? সব মজার কথাই তো কয়েকবার করে শোনা।

এটা বিশেষ মজার।

বল শুনি।

আমি এবং টুকু—আমরা দুজন ছোটবেলায় ঠিক করেছিলাম বড় হয়ে তোমাকে বিয়ে করব।

অতসীদি খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। হাসতে হাসতে তাঁর চোখে পানি এসে। গেল। তিনি সেই পানি মুছলেন না। কী অদ্ভুত দৃশ্য! অতসীদি হাসছে। আর টপটপ করে। তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে।

আমাকে বিয়ে করতে চাইতি কেন? মিষ্টি খাওয়ার লোভে?

জানি না। হয়তো।

আগে কোনোদিন আমাকে বলিস নি কেন?

বললে কী হত?

অতসীদি জবাব দিলেন না। আবার হাসতে শুরু করলেন। তাঁর হাসির মাঝখানেই আমি বললাম, আমার কিন্তু এখনো তোমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে।

অতসীদির হাসি থেমে গেল। তিনি অবাক হয়ে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি কী যে অদ্ভুত। মনে হয় জল থৈথৈ করছে। যেন এক্ষুনি কেঁদে ফেলবেন। কেঁদে ফেলবার মতো আমি কি কিছু বলেছি? অতসীদিকে এমন কিছু বলার প্রশ্নই ওঠে না।

অতসীদি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, সব সময় ঠাট্টা করা ভালো না বীরু। বলেই তিনি মাথায় আঁচল তুলে দিলেন। হিন্দু মেয়েরা মাথায় আঁচল দিলে কেমন যেন লাগে।

তুই চলে যা বীরু। বাবা এলে পাঠিয়ে দেব।

অতসীদি ছোট-ঘোট পা ফেলে চলে গেলেন। রান্নাঘর থেকে খুটট শব্দ হতে লাগল। এ ছাড়া চারপাশ কি নীরব! আমি চলে গেলাম না। বসে বসে ধীরেন কাকুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ধীরেন কাকু এলেন অনেকক্ষণ পরে। তাঁকে যতবারই দেখি, ততবারই মনে হয় আগের চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছেন। ক্লান্ত জরাগ্রস্ত মানুষের মতো চলাফেরা। কথাবার্তায়ও প্রাণের স্পর্শ বলে কিছু নেই। যেন একটা রোবট যার ব্যাটারি ডাউন হয়ে যাওয়ায় কাজকর্ম শ্লথ হয়ে গেছে। তিনি আমাকে খুব ভালো করেই চেনেন, তবু বললেন, কে?

আমি। আমি বীরু।

ও, আচ্ছা। ঠিক আছে। কার অসুখ?

বাবার।

ও, আচ্ছা আচ্ছা। চল যাই। চল।

ধীরেন কাকু ডাঙায় ভোলা মাছের মতো ঘন-ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। তাঁকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার সুযোগ দেওয়া উচিত। আমি না থাকলে হয়তো অতসীদি বাবাকে পাখা দিয়ে হাওয়া করতেন। ঠাণ্ডা পানির গ্লাস এনে সামনে রাখতেন। ধীরেন কাকু রাস্তায় নেমেই নিচু গলায় বললেন, আমার নিজেরও শরীরটা খারাপ।

ডাক্তাররা যখন বলেন, শরীরটা খারাপ তখন গোটা চিকিৎসা-শাস্ত্রটার উপর কেমন যেন সন্দেহের ভাব এসে পড়ে।

বাসায় ফিরে দেখি অল কোয়ায়েট ইন দা ইস্টার্ন ফ্রন্ট। পূর্ব দিগন্ত নিশ্চুপ। বাবার বিখ্যাত কামান-দাগানো কাশি বন্ধ হয়েছে। তিনি বারান্দার ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছেন—

চোখে-মুখে প্রশান্ত ভাব। শেভ করেছেন। চুল আঁচড়ানো হয়েছে। চায়ের কাপে টোস্ট ডুবিয়ে মুখে দিচ্ছেন। সামনে আজকের খবরের কাগজ। যে-রকম মনযোগের সঙ্গে কাগজ দেখছেন, তাতে মনে হচ্ছে আজও সম্ভবত তাঁর কোনো চিঠি ছাপা হয়েছে। নাগরিক কোনো সমস্যা নিয়ে জ্বালাময়ী কোনো চিঠি ঝিকাতলা অঞ্চলে বখাটেদের যন্ত্রণা বিষয়ে কঠিন বক্তব্যের চিঠি।

ধীরেন কাকু বললেন, আবার কী হল?

ঐ কাশি। বড় বেড়েছিল। রাতে ঘুম হয় নি।

এখন কী অবস্থা?

এখন ভালোই। বয়স হয়েছে তো। বয়সের অসুখ।

ডায়াবেটিস আছে কি না দেখান। ইউরিনটা টেষ্ট করেন।

হয়েছে কাশি, ইউরিন টেস্ট করার কেন?

চেকআপের জন্য আর কী। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটার সঙ্গে একটার যোগ আছে।

কাশিটার কী করবেন?

ক্রনিক অসুখে কবিরাজী খুব কাজ করে। পুরোনো ঘি বুকে মালিশ করে দেখতে পারেন। আমার কাছে এক শ বছরের পুরোনো ঘি আছে। পাঠিয়ে দেব।

ওষুধপত্র কিছু দেবেন না?

উঁহুঁ। ঘিটা মালিশ করে দেখেন। ওতেই আরাম হবে। উঠি তাহলে।

আরে না, উঠবেন কী? বসেন, চা খান। কথাটথা বলি। মেয়ের বিয়ের কিছু হল?

নাহ্। দেখি, পূজার সময় কোলকাতায় যাব। আমার এক শ্যালক আছে ধর্মতলায়, তাকে চিঠি দিয়েছি। খোঁজখবর করছে।

দেশে কিছু হচ্ছে না?

ধীরেন কাকু জবাব না-দিয়ে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন। আমি চলে গেলাম নিজের ঘরে। আপাতত কিছু করার নেই। এক শ বছরের পুরোনো ঘি আনবার জন্যে আরেকবার যেতে হবে। সেটা এখনই না আনলেও হবে। যে ঘি এক শ বছর অপেক্ষা করতে পেরেছে, সে আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে পারবে।

টেবিলের উপর একটা চিঠি পাওয়া গেল। পারুল চিঠিটা এমনভাবে রেখেছে যেন চট করে চোখে না পড়ে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে চিঠি খুলে সে পড়েছে। খামের মুখ দ্বিতীয় বার বন্ধ করা। আমি বিরক্ত মুখে খাম খুললাম।

চিঠি পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বিরক্তি কেটে গেল। গোপনে আমার চিঠি পড়ার জন্যে পারুলকে ক্ষমা করে দিলাম। খকখক কেশে আমার ঘুম ভাঙানোর জন্য ক্ষমা করলাম বাবাকে।

জোর করে আমাকে ধীরেন কাকুর বাসায় পাঠাবার যে অপরাধ মা করেছেন, তার জন্য মাকেও ক্ষমা করা গেল।

তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। খুবই জরুরি। তুমি সোমবার সকাল দশটা পাঁচ মিনিটে সায়েন্স ল্যাববারেটোরির পুলিশ বক্সের সামনে অপেক্ষা করবে। আবার ভুলে যে না। ইতি তোমার—এ।

তোমার—এ মানে তোমার এশা। এখা চিঠিপত্রে কখনো তার পুরো নাম লেখে না। যার কাছে চিঠি যাচ্ছে তার নামও থাকে না। এ ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার থাকে। যেমন, এই চিঠিতে সময় দিয়েছে দশটা পাঁচ মিনিট। দশটা লিখলেই হত, তা লিখবে না। গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য সঙ্গে পাঁচ মিনিট লাগিয়ে দিয়েছে। অপেক্ষা করবার জায়গাটাও চমৎকারপুলিশ বক্সের সামনে। পুলিশ বক্সের সামনে কেউ অপেক্ষা করে?

কেউ করে না। কিন্তু এশা করে। তার স্বভাবই হচ্ছে অদ্ভুত কিছু করা। একবার সে বলল, বুড়িগঙ্গায় নৌকায় কিছু ভাতের হোটল আছে, তুমি জান? খুবই নাকি ভালো রান্না। চল না, দুজন মিলে খেয়ে আসি।

যেতে হল। বুড়িগঙ্গায় নৌকার হোটেলে এশা মহানন্দে ভাত খেল। মোটা মোটা ভাত। টকটকে রঙের কী একটা মাছের ঝোল। ঝাল এমন দিয়েছে যে, চোখে পানি এসে যায়। কিন্তু এশার ধারণা, এমন চমৎকার রান্না সে জীবনে খায় নি। প্রতি সপ্তাহে একবার এসে খেয়ে যাওয়া উচিত।

ভাগ্যিস দ্বিতীয় বার তার এই শখ হয় নি। নৌকার খাবার খেয়ে আমার নিজের পেট নেমে গেল। ডায়ারিয়ার মতো হল।

আজ এশার কী পরিকল্পনা, কে জানে। আজই সোমবার। ভাগ্যিস চিঠিটা খুলেছিলাম। চিঠি পড়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহ একটু কম। একবার একটা চিঠি এক সপ্তাহ পর খুলেছিলাম। খামের উপরের লেখাটা পছন্দ ছিল না বলে ভোলা হয় নি।

দশটা বাজতে এখনো অনেক দেরি তবু আমার মনে হল, প্রস্তুতি পর্ব শুরু করে দেওয়া দরকার। বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে একটির পর একটি ঝামেলা লাগে। আজ বিশেষ দিন। ঝামেলা লাগবেই। দাড়ি কমাতে গিয়ে দেখব ব্লেডে ধার নেই। শার্ট গায়ে দেবার পর দেখা যাবে পেটের কাছের বোতাম নেই। সমস্ত বাড়ি খুঁজেও রুমাল পাওয়া যাবে না। কিংবা এর চেয়েও ভয়াবহ কিছু ঘটবে মার কলিক পেন উঠবে এবং তাঁকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতেই মার কলিক পেন ওঠে। বাঁধা নিয়ম।

অনার্স সেকেন্ড পেপারের দিন এই অবস্থা। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে চোখ-টোখ উল্টে মা এমন এক নাটক শুরু করলেন, পরীক্ষা মাথায় উঠল। বাবা চি-চি করে বলতে লাগলেন, হাঁ করে দেখছিস কি? তোর মাকে হাসপাতালে নিয়ে যা।

আমি বিড়বিড় করে বললাম, আমার পরীক্ষা।

বাবা চোখ লাল করে বললেন, চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব হারামজাদা। মানুষ মারা যাচ্ছে, আর বলে কী!!

প্রয়োজনের সময় কিছুই পাওয়া যায় না। একটা বেবি ট্যাক্সি জোগাড় করতে লাগল আধঘন্টা। সেই বেবি ট্যাক্সিও এমন যে, দুমিনিট পরপর স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। ড্রাইভারকে কার্বুরেটার খুলে ময়লা পরিষ্কার করতে হয়। মেডিক্যাল কলেজের গেটে এসে মার কলিক পেন কমে গেল। তিনি বোকার মত হাসতে লাগলেন।

আজও নিশ্চয়ই এরকম কিছু হবে। ঘর থেকে পা বাইরে ফেলবার সময় মা চিকন গলায় ডাকবেন, ওরে বীরু রে! গেলাম রে।

আর আমার স্ত্রী-ভক্ত বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠবেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে হাসপাতালে পাঠানোর জন্যে। তিনি নিজে কিন্তু যাবেন না। এর আগের বারও যান নি। হাসপাতালের ফিনাইলের গন্ধ তাঁর সহ্য হয় না। ডাক্তারদের দুর্ব্যবহার সহ্য হয় না। টেনশান সহ্য হয় না। কিছুই সহ্য হয় না।

ইদানীং হয়তো জীবনটাও অসহনীয় হয়েছে। সকাল এবং সন্ধ্যায় প্রবলবেগে খকখক করে তাই জানান দিচ্ছেন। আমি গুনগুন করে বললাম, আমরা কাশির শব্দে ঘুমিয়ে পড়ি, কাশির শব্দে জাগি। পারুল আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে কঠিন চোখে তাকাল। আগেকার আমলের মুনি-ঋষিরা হয়তো ঠিক এরকম চোখের দৃষ্টি দিয়ে মানুষকে ভস্ম করে দিতেন।

আশ্চর্য কাণ্ড, দাড়ি কাটার পর্ব বিনা ঝামেলায় পার হল! থুতনির কাছের ভয়াবহ ব্রনটাকে আহত না-করে চমৎকার একটা শেষ করে ফেললাম। ইস্ত্রি করা একটা চেক শার্ট পাওয়া গেল যার সব কটি বোম অক্ষত। তোষক উল্টে একটা রুমাল পাওয়া গেল। মোটামুটি পরিষ্কার। ভদ্রসমাজে বের করলে কেউ সরু চোখে তাকাবে না।

মার কলিক পেন এখনো শুরু হয় নি। তিনি একতলার বারান্দায় চালের গুড়ো নিয়ে বসেছেন। মনে হচ্ছে ভাপা পিঠা হবে। কদিন আগে বাবা ভাপা পিঠার কথা কী যেন বলেছিলেন। এটা হচ্ছে তারই ফলোআপ। আমরা ভাপা পিঠা, ভাপা পিঠা বলে লক্ষবার চেঁচালেও কিছু হবে না, কিন্তু বাবা মুখ দিয়ে একবার উচ্চারণ করলেই অন্য ব্যাপার। টনা-টুনীর গল্প আর কি। টুনা কহিল টুনী পিঠা তৈরি কর...।

আমি দোতলা থেকে খুব সাবধানে পা ফেলে নিচে নামলাম। সিঁড়িতে কে যেন দুধ ফেলে দিয়েছে, যে-কোনো মুহূর্তে রেলগাড়ি ঝমাঝম পা পিছলে আলুর দম হবার সম্ভাবনা।

বাবা বারান্দায়। গলায় মাফলার। কোলে খবরের কাগজ। হাতে লাল নীল পেনসিল। ইদানীং তিনি খবর আন্ডার লাইন করা শুরু করেছেন। হত্যা, রাহাজানি, ধর্ষণ এইসব লাল রঙে দাগাচ্ছেন, পলিটিক্যাল খবরগুলো নীল রঙে। আমার জন্যে বেশ সুবিধা হয়েছে। আমি দাগ দেয়া খবর বাদ দিয়ে কাগজ পড়ি। পলিটিক্স-ফলিটিক্স আমার ভালো লাগে না।

বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। এমনভাবে তাকালেন যেন আমাকে চিনতে পারছেন না, তবে চেনা-চেনা লাগছে। তিনি গলা পরিষ্কার করলেন। ঠিকমতো পরিষ্কার হল না। কফ-জমা ভারি স্বরে বললেন, আমার জিনিসটা নিয়েছি?

আপনার কোন জিনিস?

ইউরিন স্যাম্পল। সুগার আছে কি না দেখবে। বাথরুমের কে আছে। একটা পলিথিন পেপার দিয়ে মুড়ে নিয়ে যা।

আমি স্তম্ভিত। যাচ্ছি এশার কাছে পকেটে থাকবে পলিথিনে মোড়া ইউরিন। স্যাম্পল। পিতৃদেবের মূত্র।

অন্য কাউকে দিয়ে পাঠান বাবা, আমি একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি। খুবই জরুরি।

আমার কাজটা তাহলে তোমার কাছে তেমন জরুরি মনে হচ্ছে না? ভালো, ভালো, খুবই ভালো।

বাবার মুখ অন্ধকার। চশমা আরো খানিকটা স্কুলে পড়েছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে জ্যেষ্ঠ পুত্রের হৃদয়হীনতায় তিনি মর্মাহত। আমি ইতস্তত করে বললাম, বাবলুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন বাবা, ও ছাদে ক্যারাম খেলছে।

বাবা খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাকে পাঠাব তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার অত্যন্ত জরুরি কাজটি সেরে আস।

আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

তোমাকে নিতে হবে না।

আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন কেন?

তোমার সঙ্গে আমি এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলতে চাই না।

আমি খুব আহত হবার ভান করে বললাম, যাচ্ছি একটা চাকরির ব্যাপারে। পকেটে ইউরিন-ফিউরিন এই জন্যেই নিতে চাচ্ছিলাম না। না বুঝেই রাগ করেন।

লক্ষ করছি, বাবা অপ্রস্তুত বোধ করতে শুরু করেছেন। মুখ কেমন লম্বা ধরনের হয়ে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে বোকাটে। তিনি নিচু গলায় বললেন, কিসের ইন্টারভ্য?

বেক্সিমকো বলে একটা কোম্পানি।

তোর তো এমএ-র রেজাল্টই এখনো হয় নি!

রেজাল্টের আশায় বসে থাকলে আরো তিন বছর লাগবে। এখনো ভাই হয় নি। ভাইভা হবে, তারপর টিচাররা দয়া করে খাতা দেখবেন, আবার এক মাস ঘুম। তারপর চলে যাবেন বিদেশ। আর তাঁর কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাবে না। আমাদের রেজাল্টও বন্ধ।

বাবা তাঁর মুখ করুণ করে ফেললেন। বেচারাকে দেখে এখন মায়াই লাগছে। পুত্রের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁর হৃদয় আর্দ্র।

ইউরিন স্যাম্পলটা কোথায় রেখেছেন বাবা? বাথরুমের তাকে?

থাক থাক। তোকে নিতে হবে না।

কোনো অসুবিধা নেই।

আহা, বললাম তো নিতে হবে না! যাচ্ছিস একটা শুভ কাজে।

আমি প্রায় জোর করেই ইউরিন স্যাম্পল নিয়ে নিলাম। অপরাধবোধে বাবা এখন জর্জরিত। সারাক্ষণ অস্বস্তিতে ভুগবেন। দুপুর বেলা ভালো করে খেতেও পারবেন না। অথচ আর একটু হলেই উল্টো ব্যাপার ঘটত। আমি যদি বোতলটা না নিয়ে আসতাম, তাহলে অপরাধবোধ আমাকে কাবু করে ফেলত। বারবার মনে হত, বুড়ো বাবার সামান্য একটা কাজ।

ঘর থেকে পা ফেলবার ঠিক আগমুহূর্তে মা বললেন, ধীরেন বাবুর কাছ থেকে পুরোনো ঘিটা দিয়ে যাস তো বাবা।

এক্ষুনি লাগবে?

হুঁ। বুক ঘড়ঘড় করছে। মালিশ করে দেব।

আমি তো তেমন কোনো ঘড়ঘড় শুনতে পেলাম না।

যা বাবা নিয়ে আয়, কতক্ষণ আর লাগবে?

মার চোখ এখন দেখাচ্ছে অবিকল গরুর মতো। ছলছল করছে, যেন এক্ষুনি পানি উপচে পড়বে। চোখের এই আবেগ অগ্রাহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। তবে ইদানীং অনেক কঠিন কাজ বেশ সহজ ভঙ্গিতে করতে পারছি। আমি মার দিকে না তাকিয়ে বললাম, বিকেলে ফেরার পথে নিয়ে আসব। তুমি কোনো চিন্তা করবে না। বাবার কামান দাগা সন্ধ্যার আগে শুরু হবে বলে মনে হচ্ছে না।

মা আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসছেন। তার মানে মার পেটে আরো কিছু কথা রয়ে গেছে। ঘর থেকে বেরুবার পর তিনি তা উগরে দেবেন। কী বলবেন তাও আঁচ করতে পারছি। নাখালপাড়া যেতে বলবেন। আজ মাসের চব্বিশ। এই সময়ে আমাকে নাখালপাড়া যেতে হয়। আমার বড় বোনের শ্বশুরবাড়ি। তার কাছ থেকে কিছু। টাকাপয়সা আনতে হয়। পরের মাসের তিন-চার তারিখে আমাকেই সেটা ফেরত নিয়ে যেতে হয়। গত মাসে টাকা ফেরত দেওয়া হয় নি, আবার এ মাসে যাওয়া!

বাবা বীরু।

বলে ফেল।

অনুর কাছে আজ একবার যেতেই হবে। তিন শ টাকা নিয়ে আসবি। বাবা, মানিক।

পাগল হয়েছ মা! আগামী এক সপ্তাহ নাখালপাড়ার দিকে যেতে পারব না।

একটা পয়সা ঘরে নেই।

বাবাকে বল–বাবার দায়িত্ব। সংসার চালানোর দায়িত্ব তোমাকে মাথায় নিতে কে বলেছে?

মাকে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি রাস্তায় নেমে পড়লাম। চমৎকার একটা দিন। ঝকঝকে রোদ। বাতাস মধুর এবং শীতল। এই বাতাস আজ সারাদিনেও হয়তো তেতে উঠবে না। তবে একে না পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা। তখন সবই অসহ্য বোধ হবে।

এই বীরু, যাচ্ছিস কোথায়?

আমি কয়েক মিনিট চিন্তা করলাম, জবাব দেব কী দেব না। টুকু নর্দমার পাশে পেচ্ছাব করতে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে সেখান থেকেই কথা বলছে। তার ছোটখাটো মুখে বিশাল এক গোঁফ। কুৎসিত দেখাচ্ছে।

ব্যাপার কী, সাউন্ড দিচ্ছি না কেন? যাচ্ছিস কোথায়?

ঠিক নেই কিছু।

তোর কাছে দশটা টাকা হবে নাকি?

না।

পাঁচটা হবে কি না দেখু। শালা পকেট একেবারে ইয়ে।

হবে না।

তাহলে একটা সিগারেট খাওয়া দোস্ত। রিকোয়েস্ট।

আমি দুটো সিগারেট কিনলাম। সিগারেট দিয়ে যদি সহজে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এই আশাতেই কেনা। টুকু ছোঁ মেরে সিগারেট নিয়ে হাসিমুখে বলল,

একটা চায়ের পয়সা দিয়ে যা দোস্ত। তোর পায়ে ধরি।

টুকু সত্যি-সত্যি পা ধরতে এল। গুণ্ডামি করলেও টুকু জাতে ওঠে নি। কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। বিনা পয়সায় চা-সিগারেট খাওয়ায় না। নগদ পয়সা দিতে হয়।

দোস্ত, আমার রিকোয়েস্টটা রাখ। একটা পাত্তি ছেড়ে দে।

তুই অতসীদিকে কী বলেছিলি?

টুকু দপ করে নিভে গেল। মুখ আমশি করে বলল, মিসটেক হয়ে গেছে, বুঝতে পারি নি। আমি ভাবলাম নতুন কেউ। এমন লজ্জা পেয়েছি! আর বলিস না। রাতে ঘুম হয় নি।

অতসীদি তোকে যেতে বলেছে।

সত্যি?

হুঁ।

যাব কী করে, বল?

হেঁটে হেঁটে যাবি। আর কীভাবে যাবি? তোর জন্যে পালকি লাগবে?

অতসীদি আর কী বলল?

উনি আর কিছু বলেন নি–আমি বললাম।

কী বললি?

বললাম, তুই ঠিক করে রেখেছিলি বড় হয়ে অতসীদিকে বিয়ে করবি।

টুকু ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে তাকে।

আর কী বললি?

জিজ্ঞেস করল, তুই আজকাল কী করি। আমি বললাম, ছিনতাইয়ের কাজ। করে। পার্ট-টাইম কাজ। ফুল-টাইম কাজ হচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা, পরিচিত। কাউকে পেলে ভিক্ষা চাওয়া।

ব্লাফ দিচ্ছিস, ঠিক না?

ব্লাফ দেব কেন, ব্লাফ দেবার আমার দরকারটা কি? হাত ছাড়, আমার জরুরি। কাজ আছে।

টুকু আমার হাত ছাড়ল না সঙ্গে-সঙ্গে আসতে থাকল। তার গা থেকে বিকট গন্ধ আসছে। আমি বললাম, আজকাল গাঁজা খাচ্ছিস নাকি? গন্ধে নাড়িভূড়ি উলটে আসছে।

টুকু বিড়বিড় করে বলল, কী যে বলিস দোস্ত। ভদ্রলোকের ছেলে না আমি। সস্তার সিগারেট, এই জন্যেই গায়ে গন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা দোস্ত, সত্যি কথাটা ব, অতসীদি কি যেতে বলেছে?

হুঁ।

ঐদিনের ব্যাপারটায় মাইভ করেছে, তাই না?

হুঁ। এখন হাত ছাড়ু। তুই আমার হাত গান্ধা বানিয়ে ফেলেছিস। অতসীদির কাছে যাবার আগে গরম পানি দিয়ে গোসল করিস।

টুকু হাত ছেড়ে দিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। চায়ের পয়সা চাইল না। তার মুখের সিগারেটও নিভে গেছে। সে তা বুঝতে পারছে না। নেভানো সিগারেট প্রাণপণে টানছে। আমি বললাম, কী যন্ত্রণা, এখনো সঙ্গে-সঙ্গে আসছিস কেন? টুকু ফিসফিস করে বলল, হাজার পাঁচেক টাকা জোগাড় করে এনে দিতে পারবি? এক মাসে ডাবল করে রিটার্ন দেব। আপ অন গড়।

করবি কী টাকা দিয়ে?

কাউকে বলিস না দোস্ত। একটা পিস্তল কিব। জার্মান জিনিস।

তোর দৌড় ব্লেড পর্যন্ত। পিস্তল দিয়ে করবি কী? হাত ছাড়্।

টুকু হাত ছেড়ে দিয়ে আবার রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্যাটার বহুমূত্র হয়েছে। কি না কে জানে। সব সময় দেখি রাস্তার পাশে প্যান্টের জিপার খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

পুলিশ বক্সের সামনে এশা নেই।

মৈনাক পর্বতের সাইজের এক পুলিশ অফিসার পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন। সে চাচ্ছে, এ-শহরের সবাই তার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে হামাগুড়ি দিক। সার্জেন্টের হাতে ওয়াকি টকি। কার সঙ্গে যেন খোশগল্প করছে। ঘন-ঘন বলছে, আরে ব্যাটা বুদ্ধ, সহজ কথা বুঝলি না? আমার জায়গায় মাসুম হলে পুলিশ সার্জেন্টকে দুম করে এক অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসত। হয়তো বলত, এই যে ব্রাদার, আপনি এত মোটা কী করে হলেন, কাইন্ডলি আমাকে বলবেন? অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্টে প্রশ্নটা করছি। আমি ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনের ছাত্র। প্রশ্ন শুনে সার্জেন্টের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত। জবাব দেবার আগেই মাসুম দ্বিতীয় প্রশ্ন করত। সেটি হত প্রথমটির চেয়েও ভয়াবহ।

পাবলিক লাইব্রেরিতে মাসুমের সঙ্গে গিয়েছি। মাসুমের কাজে। লাইব্রেরির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কী একটা বই সে ঘন্টা খানিক ধরে খুঁজল। না পেয়ে মহা বিরক্ত। বিরক্তি কাটাবার জন্যেই বোধহয় আমাকে বলল, চল লাইব্রেরিয়ান ব্যাটাকে ভড়কে দিই। গেলাম তার সঙ্গে। লাইব্রেরিয়ান বেচারা বুড়ো মানুষ। কেমন ভালোমানুষ তালোমানুষ চেহারা। মাসুম তাঁর কাছে গিয়ে নিচু গলায় বলল, স্যার, মানুষ খুন করার সহজ পদ্ধতি, এই জাতীয় কোনো বইপত্র আছে? আমাদের বিশেষ দরকার।

লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। মাসুম গলার স্বর আরো খানিকটা নামিয়ে বলল, ছুরি, বোমা দিয়ে মানুষ মেরে তোতা স্যার কোনো থ্রিল নেই। আমরা চাচ্ছি নতুন ধরনের কিছু। হাইলি সাইন্টিফিক ধরনের। মডার্ন।

মাসুমের মতো কিছু একটা করতে ইচ্ছে হচ্ছে। দুপা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আমি পুলিশ অফিসারটিকে চমকে দিয়ে বললাম, আচ্ছা ভাই, এখানে কি একটি মেয়েকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন?

পুলিশ সার্জেন্ট সত্যি-সত্যি চমকাল। অবাক হয়ে বলল, আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, আপনাকে। লম্বা একটা মেয়ে কোঁকড়ানো চুল। সাধারণত তার কাঁধে চটের একটা ব্যাগ ঝোলানো থাকে। পুলিশ-বক্সের সামনে তার অপেক্ষা করার কথা।

এত জায়গা থাকতে পুলিশ-বক্সের সামনে কেন?

পুলিশদের আশেপাশে ঝামেলা কম থাকে, এই জন্যেই বোধহয়। আপনি তাহলে দেখেন নি?

লোকটি হেসে ফেলল। বেশ অন্তরঙ্গ হাসি। হাসতে-হাসতেই বলল, চা খাবেন?

এবার আমার চমকাবার পালা। এ আমাকে চা খেতে বলছে কেন? যেভাবে বলছে, তাতে মনে হচ্ছে না ঠাট্টা করছে।

আমি আপনাকে চিনি, আপনার নাম বীরু। শহীদুল্লাহ হলে আপনি রুম নাম্বার দুই হাজার তিরিশে মাঝে-মাঝে ঘুমাতেন।

এখনো ঘুমাই।

পাস করেন নি?

পরীক্ষাই হয় নি, পাস করব কীভাবে? ইউনিভার্সিটি থেকে বেরুতে আগে চার বছর লাগত, এখন দশ-বার বছর লাগে। আপনি কি শহীদুল্লাহ হলে ছিলেন নাকি?

জ্বি। দুই হাজার তেইশ। অনার্স কমপ্লিট করে ঢুকে গেলাম পুলিশে। সারদায় দুবছর ট্রেনিং নিয়ে এখন সার্জেন্ট।

ভালো করেছেন।

একটু দাঁড়ান, চা নিয়ে আসছি। বাসা থেকে ফ্লাস্কে করে নিয়ে আসি। চা খেতে খেতে অপেক্ষা করুন, এর মধ্যে হয়তো আপনার রোগা লম্বা, চটের ব্যাগ কাঁধের মেয়ে চলে আসবে।

বাসায় তৈরি চা, কিন্তু দোকানের চায়ের চেয়েও বিস্বাদ। তার উপর ঠাণ্ডা মেরে আছে। এরকম একজন জবরদস্ত পুলিশ সার্জেন্টের চোখের সামনে চা ঢেলে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। আমি বিরক্ত মুখে চায়ে চুমুক দিচ্ছি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি, যদি এশার দেখা পাওয়া যায়।

বীর সাহেব।

জ্বি, বলুন।

আপনারা এখনো এম.এ. পাশ করতে পারেন নি, ভাবাই যায় না। আমি চাকরিতে জয়েন করে ভালোই করেছি, কী বলেন?

খুব ভালো করেছেন। মিলিটারিতে ঢুকতে পারলে আরো ভালো করতেন।

ঠাট্টা করছেন?

হ্যাঁ ভাই, করছি। পুলিশের সঙ্গে ঠাট্টা করে দেখলাম কেমন লাগে।

সে হেসে ফেলল। তাকে এখন আর আগের মতো ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। তার দাঁড়িয়ে থাকার যে-ভঙ্গিটি এতক্ষণ অসহ্য মনে হচ্ছিল, এখন সেটাকেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে পুলিশদের এভাবেই দাঁড়াতে হয়।

বীরু সাহেব।

জ্বি, বলুন।

খুব টেনশনের চাকরি। টেনশনে শরীর ফুলে এরকম হয়েছে।

বলেন কী। আমার তো ধারণা ছিল উল্টোটা হয়।

একেক জনের বেলায় একেক রকম হয়। টেনশনে হরমোন ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায়, তার থেকে এই হয়। কেউ শুকিয়ে যায়, কেউ আমার মতো হয়।

বাহ্ ইন্টারেস্টিং তো!

আমি যদি কিছু নাও খাই, ফুলতে থাকব। এই যে এত বেলা হয়েছে, আমি কিন্তু চার কাপ চা ছাড়া কিছু খাই নি। ভাত খেতে খেতে দুটা বেজে যাবে।

খিদে লাগে না?

লাগে না আবার! এখন মনে হচ্ছে একটা বেবি ট্যাক্সি খেয়ে ফেলি। হা হা হা।

আমি হাসিতে যোগ দিলাম না। এশার উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। এরকম করার মানে কি? কতক্ষণ আমি অপেক্ষা করব? শহীদুল্লাহ হলের এই প্রাক্তন ছাত্র মনে হচ্ছে অতিরিক্ত রকমের মাইডিয়ার। তার তেলতেলে ধরনের ব্যবহার এখন আর ভালো লাগছে না। ভাড়া ঠিক না-করেই আমি একটা খালি রিকশায় উঠে বললাম, চলি, কেমন?

আবার আসবেন। সকালবেলায় আমি এইখানেই থাকি। আর যদি আমাকে না। দেখেন, তাহলে জিজ্ঞেস করবেন—সার্জেন্ট শামসুদ্দিন কোথায়? ওরা ওয়াকি টকিতে ইনফরমেশন দিয়ে দেবে।

আমি হেসে ফেললাম। সার্জেন্ট শামসুদ্দিন এমনভাবে কথা বলছে, যে শিগগিরই আমি তার বিরহে ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসব পুলিশ-বক্সে। ওয়াকি টকির চল্লিশ মাইল ব্যাসার্ধে বারবার বলা হবে, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন, আপনার বন্ধু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন, চলে আসুন। হ্যালো, হ্যালো, সার্জেন্ট শামসুদ্দিন...।

বীর সাহেব।

জ্বি বলুন।

আবার দেখা হবে, কেমন?

তা তো হবেই। মিছিল নিয়ে যখন আসব তখন দেখা হবে। পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেব।

সার্জেন্ট শামসুদ্দিনের মুখ কেমন হয়ে গেল। সে যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। বিড়বিড় করে বলল, এসব কী বলছেন ভাই!

সত্যি কথাই বলছি। দি টুথ। আমরা আপনাদের পেটাব, আপনারা আমাদের। আমরা ঢিল ছুঁড়বো। আপনারা আমাদের উপর ট্রাক তুলে দেবেন। টিয়ার গ্যাস, গুলি এইসব চলবে।

আমাদের এসব বলছেন কেন? আমাদের দোষটা কোথায়?

ঠাট্টা করছি রে ভাই, ঠাট্টা। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে রসিকতা।

ও তাই বলুন।

সার্জেন্ট শামসুদ্দিন হেসে ফেলল। তার দাঁতগুলো চমৎকার। টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন হয়। নতুন ধরনের কোনো বিজ্ঞাপন কি দেয়া যায় না? একজন পুলিশ সার্জেন্ট টুথব্রাশ হাতে নিয়ে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে লেখা—শান্তির এই প্রহরীর হাসিটিও প্রশান্তির।

কারণ ইনি ব্যবহার করেন পিয়া টুথপেস্ট। পিয়া টুথপেস্ট এখন নতুন মোড়কে পাওয়া যাচ্ছে।

বাতাস আর মধুর মনে হচ্ছে না। রোদ ঝাঁঝাঁ করছে। আকাশ ধূসর বর্ণ। কড়া রোদে আকাশ ধূসর হয়ে যায়। তাকালেই বমি-বমি ভাব হয়। এ সঙ্গে থাকলে এই ধূসর আকাশই হয়তো অন্যরকম লাগত। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম—এশার সঙ্গে অনেক দিন পরপর আমার দেখা হয়।

রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে বারবার আমাকে দেখছে। সার্জেন্টের সঙ্গে আমার খাতির দেখে সম্ভবত আক্কেল গুড়ুম হয়েছে। ভাড়া নিয়ে কোনো ঝামেলা করবে না। যা দেব তাই সোনা মুখ করে নেবে। অনেক দিন ধরেই পকেটে একটা তাপ্পি মারা পাঁচ টাকার নোট পড়ে আছে। চালানো যাচ্ছে না! এই রিকশাওয়ালার উপর একটা অ্যাটেম্পট নেয়া যেতে পারে।

স্যার, কই যাইবেন?

তাই তো, কোথায় যাওয়া যায়। রিকশায় উঠলেই আমার একটা সমস্যা হয়। হঠাৎ মনে হয় আমার যেন কোথাও যাবার জায়গা নেই। বাসে এই সমস্যা নেই। বাসের একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য আছে। রিকশার নেই। রিকশায় উঠে গন্তব্যের কথা বলে দিতে হয়।

স্যার, কোন দিকে যাইবেন?

আরে বাবা, তুমি চালাও না! এত অস্থির হয়ে গেলে কেন?

রিকশাওয়ালা ঘাড় ফিরিয়ে কুৎসিত চোখে আমাকে দেখল, যেন আমরা একে অন্যের শত্রু। তারপর প্যাডেল চাপতে লাগল নিতান্ত অনিচ্ছায়। এক শত্রু অন্য শত্রুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা মন্দ নয়। আমি সিগারেট ধরিয়ে ভাবতে লাগলাম, কোথায় যাওয়া যায়। যাত্রাবাড়ির দিকে গেলে কেমন হয়? যাত্রাবাড়ি হচ্ছে এশাদের বাড়ি। এশার বাবা অন্য এক জনের জমি জবরদখল করে দুতিনটা ঘর তুলে দিব্যি আছেন। হাফ বিল্ডিং। পাকা দেয়াল। উপরে টিন।

যাত্রাবাড়িতে গেলে এশাকে অবশ্যি পাওয়া যাবে না। এশা এমন মেয়ে, যাকে কোথাও পাওয়া যায় না। ওদের নিজের বাড়িতে তো নয়ই। আমি কখনো গিয়ে পাই। নি।

রাত দশটায় একবার ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনি, এশা এখনো ফেরে নি। কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারে না। একটি মেয়ে যে এত রাত পর্যন্ত বাইরে, তা নিয়েও কাউকে চিন্তিত মনে হল না। এশার বাবা বিকট একটা হাই তুলে বললেন, তোমার খুব দরকার থাকলে অপেক্ষা কর, চলে আসবে।

কোথায় গেছে সে?

বলে যায় নি তো!

এত রাতে একা-একা ফিরবে?

তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, কেউ দিয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

বিন্দুমাত্র উদ্বেগ আমি লোকটার মধ্যে দেখলাম না, যেন এশা রাতে বাড়ি না-ফিরলেও তাঁর ঘুমের তেমন অসুবিধা হবে না।

কি, তুমি চলে যাবে, না থাকবে?

বসি কিছুক্ষণ।

তুমি কি ওর সঙ্গে পড়?

জ্বি।

ভালো খুব ভালো।

আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এ-বাড়িতে অপেক্ষা করাও যন্ত্রণা। বসার ঘরটা খুপরির মতো ছোট। ভাদ্র মাসের অসহ্য গরম। ঘরের আধখানা জুড়ে এক চৌকি। সেই চৌকিতে আশ্রয় নিয়েছেন লোমশ শরীরের এক ভদ্রলোক। ঘুমিয়ে পড়েছেন কি না। বোঝা যাচ্ছে না। নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। আবার এদিকে দেখি হাত পাখাও চলছে। ভদ্রলোকের পাশে এশার সবচে ছোট বোনটি। তার মাথার নিচে বালিশ নেই। কাঁথা খুঁজে বালিশের মতো করে দেওয়া। মেয়েটি গরমে ঘুমুতে পারছে না। মাঝে-মাঝে উঠে বসছে।

রাত এগারটায় এশার বাবা একটা ভেজা গামছা গায়ে জড়িয়ে বসার ঘরে ঢুকে বললেন, তুমি চলে যাও, আজ বোধহয় ও আসবে না।

আসবে না তো যাবে কোথায়?

মীরপুরে ওর খালার বাড়ি। মনে হচ্ছে, ওখানেই থেকে যাবে। মাঝে-মাঝে রাত বেশি হলে থেকে যায়।

খবর দেয় না?

কীভাবে দেবে, ও বাড়িতে কি টেলিফোন আছে?

আপনার চিন্তা হচ্ছে না?

ভদ্রলোক এমনভাবে তাকালেন যেন আমার বেয়াদবিতে স্তম্ভিত হয়েছেন। তিনি কী বলবেন মনে-মনে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খুব রেগে গেলে মানুষ মজার-মজার সব কথা বলে। অবশ্যি ভদ্রলোক মজার কিছু বললেন না। বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাড়ি চলে যাও, নয়ত বাস পাবে না। লাস্ট বাস সাড়ে এগারটায়।

বাস সত্যি-সত্যি পেলাম না। তিন মাইলের মতো হেঁটে একটা রিকশা জোগাড় করতে হল। রিকশায় ওঠামাত্র রিকশাওয়ালা যে কথা বলল, তার সারমর্ম হচ্ছেকলেজ গার্ল লাগবে কি না। তার সন্ধানে প্রচুর কলেজ গার্ল আছে। ভালো ফ্যামিলির মেয়ে। অভাবে পড়ে এই লাইনে এসেছে।

আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। রিকশাওয়ালা আমার জন্যে কলেজ গার্ল জোগাড় করে ফেলেছে এই জন্যে নয়। এরা একটা চক্রের সঙ্গে আছে। এদের হাতে যেমন কলেজ গার্ল আছে, তেমনি গুণ্ডাপাণ্ডাও আছে। পেটে ছুরি বসিয়ে আমাকে নর্দমায় ফেলে দেওয়া এদের কাছে

ছেলেখেলা। আমি রিকশাওয়ালাকে খুশি রাখবার জন্যেই সরাসরি না বললাম না। বললাম, খরচপাতি কীরকম লাগবে?

রেইট হইল গিয়া আফনের ঘন্টা হিসাবে। পঞ্চাশ আছে, যাইট আছে, আবার ধরেন গিয়া এক শ আছে। যেমুন জিনিস তেমুন দাম।

আরে সর্বনাশ, আমার কাছে আছেই মাত্র দশ টাকা। আরেক দিন আসা যাবে।

বাস স্ট্যান্ডের বগলে দোকানে আমার নাম কইয়েন, তাইলে খবর পাইবেন।

কি নাম তোমার?

বদিউল।

ঠিক আছে বদিউল, তোমাকে খুঁজে বের করব। দুএকদিনের মধ্যেই আসব। তবে খরচপাতি অনেক বেশি।

সেইটা আমি দেখমু। খরচপাতির জইন্যে চিন্তা করবেন না।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যাত্রাবাড়ির দিকে আর আসছি না।

বদিউল নামের রিকশাওয়ালা আমাকে চিনে ফেলতে পারে। চিনে ফেললে হয়তো চেপে ধরবে। ঘন্টা হিসেবে এক জন কলেজ গার্ল জুটিয়ে দেবে। সেই কলেজ গার্ল নিয়ে আমি করব কী? যাব কোথায়? ঢাকা শহর গিজগিজ করছে মানুষে। একটা গর্ত খুড়লে সেই

গর্ত দেখার জন্যে হাজার-হাজার মানুষ জমে যায়। একটা মাইক ফিট করে হ্যালো ওয়ান টু থ্রি বললে চার-পাঁচ হাজার লোক দাঁড়িয়ে যায়। এখানে নিরিবিলি কোথায় যে কলেজ গার্লের সঙ্গে দুএকটা মিষ্টি কথা বলব? এশার সঙ্গে তিন বছর ধরে আমার পরিচয়, এখনো একটু নিরিবিলি পাই নি যে, হাত ধরে গাঢ়স্বরে দুএকটা কথা বলব কিংবা ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে যাব। ভালবাসার মেয়েকে চুমু খেতে কেমন লাগে কে জানে?

৪. রিকশা যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত যাবে না

আমার এই রিকশা নিশ্চয়ই যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত যাবে না। তবু একবার জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। আমি বললাম, এই, যাত্রাবাড়ি যাবে?

না।

না কেন? যাত্রাবাড়িতে অসুবিধা কি?

যামু না—যামু না। ব্যাস ফুরাইল।

এত সহজে ফুরালে তো হবে না। কেন তুমি যাবে না সেটা বল।

রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে আমার দিকে তাকাল। লোকটা বয়সে সম্ভবত আমার বাবার কাছাকাছি। তাকাচ্ছেও আমার বাবার মতো করে, যেন আমার আচরণে মর্মাহত। আমাকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না। রাগে যে সে কাঁপছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। এক জন মানুষকে রাগিয়ে-রাগিয়ে ব্রেকিং পয়েন্টে নিয়ে যাওয়ার একটা আলাদা মজা আছে। আমি অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেট ধরালাম। কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়লাম এবং বরফ-শীতল গলায় বললাম, চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? বল, তুমি কেন যাবে না?

রিকশা বদলির টাইম হইছে।

ও, এই ব্যাপার। আমি ভাবলাম আমাকে বোধহয় তোমার পছন্দ হচ্ছে না, এই জন্যে যেতে চাচ্ছ না। আচ্ছা এখন বল রিকশা বদলির কথাটা তুমি আগে কেন বললে না।

কি কইলেন?

রিকশা বদলির টাইম হয়েছে এই কথাটা তুমি আগে কেন বললে না। আগে বলতে কি অসুবিধা ছিল?

এমুন করতাছেন ক্যান ভাইজান? আমি আপনেরে কী করছি?

লোকটির গলা শুনে মনে হল সে এক্ষনি কেটে ফেলবে। এই শ্রেণীর লোকরা ব্রেকিং পয়েন্টে এসে রুখে দাঁড়ায়। এর বেলায় অন্যরকম হচ্ছে। এ কেঁদে ফেলতে যাচ্ছে। শহরের খাঁটি রিকশাওয়ালা সে এখনো হয়ে ওঠে নি। হয়তো কিছুদিন আগেও পান্তাভাত খেয়ে সূর্য ওঠার আগে জমি চাষ করতে যেত। এর গায়ে এখনো শস্যের গন্ধ লেগে আছে। আমি রিকশা থেকে নেমে পকেটে হাত দিলাম। তাপ্পি মারা নোট, না তাকে আমি চকচকে নোটই দেব। যা ন্যায্য ভাড়া, তার সঙ্গে বকশিশ হিসেবে দুটি টাকা ধরে দেব।

রিকশাওয়ালা ভাড়া নিল না। পকেট থেকে হাত বের করবার আগেই সে দ্রুত প্যাডেল চাপতে শুরু করল। একবার পিছনে ফিরল না। এ্যাই এ্যাই করে দু বার তাকে আমি ডাকলাম। সে আমাকে পুরোপরি উপেক্ষা করে বিপজ্জনকভাবে একটা বেবি ট্যাক্সিকে ওভারটেক করল। এই রিকশাওয়ালাটা অভিমানী। কে জানে। হয়তো ইতিমধ্যে তার চোখে পানি এসে গেছে।

এই রিকশাওয়ালার সঙ্গে নিশ্চয়ই আরো অনেকবার আমার দেখা হবে কিন্তু তাকে চিনতে পারব না। আমরা রিকশাওয়ালার চেহারা কখনো ভালো করে দেখি না। তাদের পেছনটাই দেখি।

এক জন রিকশাওয়ালা ভাড়া না নিয়ে চলে গিয়েছে এটা এমন কোন বড় ব্যাপার নয়। অনেক রিকশাওয়ালা আমাকে ঠকিয়েছে। ভাংতি হিসেবে অচল নোট দিয়েছে। জোর করে বেশি আদায় করেছে। এক জন তো দল পাকিয়ে আমাকে মারতে পর্যন্ত এসেছিল। সেইভাবে হিসেব করলে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু হচ্ছে না।

এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে ঢাকা শহরে আমার যাবার কোনো জায়গা নেই। বাবার ইউরিন-ভর্তি শিশি পকেটে নিয়ে আমি ঢাকার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াব। এই বোধহয় আমার নিয়তি। বাবার পেচ্ছাবের শিশি পকেটে আছে বলেই কি এরকম হচ্ছে? অসম্ভব নয়। সব জিনিসেরই কিছু-না-কিছু আছর আছে। There are many things in heaven and earth..... স্বয়ং শেক্সপিয়ারের কথা। শিশিটা পকেট থেকে ফেলে দিলে কেমন হয়? এটা তো এমন মহামূল্যবান কিছু নয়। কালও জোগাড় করা যেতে পারে। এবং সেটাই বোধহয় ভালো হবে। ফ্রেশ জিনিস নিয়ে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দেব। এমিতেই তো এই বস্তু অনেকক্ষণ পকেটে আছে, বাসি হয়ে যাবার কথা। তবে কে জানে মলমূত্র হয়তো যত বাসি হয় ততই ফ্রেশ হয়।

আমি শিশিটা নর্দমায় ফেলে দিলাম। আশ্চর্য কাণ্ড ফেলে দেবার পরপর মনে হল আমি একটা অন্যায় করেছি। বেচারা বাবা হয়তো অপেক্ষা করে থাকবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই অপরাধবোেধ আমাকে কাবু করে ফেলল। এর হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কোনো-একটা কাজ করা। অন্ধকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দেওয়া জাতীয় কিছু। কিংবা মার কথামতো নাখালপাড়া চলে যাওয়া। বাবার কাজটি করতে না-পারার অপরাধ মোচন হবে মার কাজটি নিখুঁতভাবে যদি করা যায়।

নাখালপাড়া যাওয়াটা কোনো সমস্যা নয়। গুলিস্তানে গেলেই টেম্পো পাওয়া যাবে। চমৎকার জিনিস। আধুনিক ঢাকার যানবাহনের জগতে বিপ্লব। একের মধ্যে কুড়ি। ইদানীং আবার মহিলারা উঠতে শুরু করেছেন। আগে উঠত মাতারিশ্রেণীর মহিলা। ওদের দেশে-দেখে ভরসা পেয়ে আধুনিকারা উঠতে শুরু করেছেন। এমিতে তাঁদের গায়ের সঙ্গে একটু ছোঁয়া লাগলেই ছাৎ করে ওঠেন। টেম্পোতে অন্য ব্যাপার। গায়ের সঙ্গে গা লেপ্টে থাকে, তবু আধুনিকারা শব্দ করেন না। চোখে চোখ পড়লে বড় বোনসুলত হাসি দেন। মেয়ে যাত্রী যেভাবে বাড়ছে তাতে মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে মহিলা টেম্পো চালু হবে। এরশাদ সাহেবের মহিলাবিষয়ক কোনো মন্ত্রী এসে শুভ উদ্বোধন করবেন। গলা কাঁপিয়ে একটি ভাষণ দেবেন—এ দেশের নির্যাতিত অবহেলিত নারীজাতির জন্যে আজ একটি ঐতিহাসিক দিন, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই দিনটির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মহিলাদের স্বাধিকার অর্জনের একটি ধাপ হচ্ছে এই মহিলা টেম্পো। আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা জনগণের চোখের মণি আলহাজ্জ হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ মহিলাদের জন্যে যা করেছেন, তা অতীতে কেউ করেন নি, ভবিষ্যতেও কেউ করবে না। এই যে কুৎসিত যৌতুক প্রথা.....

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীর ভাষণ সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে আমি একটি টেম্পোতে উঠে পড়লাম। টেম্পো ছাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে রাজনীতি শুরু হয়ে গেল। দেখা গেল প্রাণপ্রিয় নেতার দিন যে শেষ, এই বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। একজন খবর দিল লন্ডনে একটি হোটেল

কেনা হয়েছে। নেতা দেশ ছেড়ে দিয়ে সরাসরি হোটেলের ম্যানেজারি শুরু করবেন। সেই হোটেলে উন্নতমানের বাংলাদেশি খাবার সরবরাহ করা হবে।

ঘড়িতে বাজছে বারটা দশ। অনু আপার বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে বারটা বেজে যাবে। এটা বেশ ভালোই হল। দুলাভাই নামক প্রাণীটির সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি থাকবেন অফিসে। দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে না, এই আনন্দেই টেম্পোযাত্রার কষ্ট সহ্য করা যায়।

আমার দুলাভাই লোকটি অতি ভদ্র। তাঁর আচার-ব্যবহার সবই মোলায়েম। তাঁর সবকিছুই সূক্ষ্ম রুচিবোধ সূক্ষ্ম, বুদ্ধি সূক্ষ্ম, চিন্তা-ভাবনা সূক্ষ্ম এমনকি তার গোঁফ জোড়াটাও সূক্ষ্ম। জোৎস্না দেখবার জন্যে তিনি ছাদে বসে থাকেন। মাসে এক বার গ্রুপ থিয়েটারের নাটক দেখেন। গ্রন্থমেলা থেকে কবিতার বই ছাড়া কিছু কেনেন না। বাসায় রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছবি। ২৫শে বৈশাখ এবং ২২শে শ্রাবণ এই দুদিন রবীন্দ্রনাথের ছবিতে মালা দেয়া হয়।

দুলাভাইয়ের তুলনায় অনু আপার সব কিছুই স্থূল ধরনের। বুদ্ধি স্থূল। আচারআচরণও সেই রকম। শরীরও মোটা। অবশ্য মোটাটা ইদানীং হয়েছে। আগে ছিল ছিপছিপে ধরনের। বুদ্ধির অভাব অনু আপা রূপ দিয়ে বহুগুণে পুষিয়ে দিয়েছিল। কাটাকাটা চোখ-মুখ। বইপত্রে কাঁচাহলুদ বর্ণের যে-সব নায়িকাদের কথা থাকে, তাদের সবার চেয়েই অনু আপা সুন্দর। সুন্দরী মেয়েদের বোকা-বোকা কথাও শুনতে ভালো লাগে, এটা বোধহয় সত্যি। অনু আপার মুগ্ধ ভক্ত প্রচুর জুটে গেল। বিরাট যন্ত্রণা! অনু আপা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে গেছে। তাকে নকল সাপ্লাই দেবার জন্যে সঙ্গে গেল এ পাড়ার ছসাত জন ভক্তের একটা জঙ্গীদল। কোন

খাতা কার কাছে যাবে, সেই খবরও এক জন নিয়ে এল। এত করেও লাভ হল না। অনু আপা ম্যাট্রিক পাশ করতে পারল না।

তাতে অসুবিধা তেমন হল না।

বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে লোকজন আসতেই লাগল। প্রায় বিকেলেই দেখা যেত বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে। সেই গাড়ি থেকে মোটা ধরনের গয়নায় মোড়া মহিলারা বের হচ্ছেন। তাঁদের সবার মুখে তেলতেলে একটা ভাব। বাংলাদেশে রূপবতী মেয়েদের যে আকাল যাচ্ছে, তা এই প্রথম আমরা বুঝলাম। প্রফেসর, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি অফিসার। কত রকম ঝোলাঝুলি, ধরাধরি। বিশ্রী ব্যাপার।

বাবা খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। অহঙ্কারী-অহঙ্কারী একটা ভাব চলে এল তাঁর মধ্যে। এ রকম রূপবতী একটি কন্যাকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন—অহঙ্কার হবারই কথা। তাঁর কথাবার্তার ধরন পর্যন্ত বদলে গেল। পাত্রপক্ষের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাঁর গলার স্বর কেমন সরু হয়ে যেতে শুরু করল।

আপনাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে ভালো কথা। শুনে সুখী হলাম। আমাদের তো ছেলে পছন্দের একটা ব্যাপার আছে। বংশ দেখতে হবে, আচার-ব্যবহার দেখতে হবে। একটা মেয়েকে জন্মের মতো দিয়ে দেবনা দেখেশুনে দেই কীভাবে?

বাবার দেখাশোনা এবং বাছাবাছি চলতেই লাগল। কাউকে পছন্দ হয়, কথাবার্তা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসে তখন বাবা বললেন, উঁহু, বংশে গণ্ডগোল আছে। সব কিছুর রুট হচ্ছে বংশ। ঐ জায়গায় গণ্ডগোল থাকলে সবই গণ্ডগোল।

আমরা দিন কাটাচ্ছি আতঙ্কের মধ্যে। গুজব রটে গেছে কে নাকি অ্যাসিডের বোতল নিয়ে ঘুরছে। সুযোগমত অনু আপার মুখে ঢালবে। সুযোগ পাচ্ছে না। অনু আপার বন্দিজীবন কাটছে। ঘর থেকে বেরুনো বন্ধ। জানালার পাশে যাওয়া বন্ধ। বারান্দায় দাঁড়ানো বন্ধ। বেচার শুধু কাঁদে আর হয়তো মনে-মনে ভাবে-একটা বিয়ে হোক, ঝামেলা শেষ হোক।

আমার প্রতিভাবান বাবা অনেক দেখেশুনে যে চিজটিকে বের করলেন, তার নাম ইসমাইল হোসেন। শ্রাবণ মাসে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সাত দিন পর অনু আপা ফিরাযাত্রায় এল। মা জিজ্ঞেস করলেন, বর কেমন রে?

অনু আপা মুখ শুকনো করে বলল, ভালোই। কিন্তু মারধোর করে। মা আকাশ থেকে পড়লেন, মারধোর করে মানে কী সর্বনাশের কথা! মারধোর করবে কেন?

জানি না মা

বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, বেকুব মেয়ে, কী বুঝতে কী বুঝেছে। গায়ে ধাক্কাটাক্কা লেগেছে বোধহয়।

অনু আপা ঠিকই বুঝেছিল। লোকটা অসুস্থ নির্বিকার মারধোর করে। অথচ কথা বলবার সময় কী মিষ্টি-মিষ্টি কথা! হারামজাদা ছোটলোক।

কেমন আছিসরে আপা?

অনু আপা বলল, আমি ভালো আছি, তোর কী হয়েছে? এরকম লাগছে কেন তোকে?

কী রকম লাগছে?

অসুখ অসুখ লাগছে।

আমার শরীর ঠিকই আছে। বাবার অবস্থা কাহিল।

সে কী! কী হয়েছে?

ভয়াবহ কাশি। শতিনেক টাকা থাকলে দে। চলে যাব। সময় নেই।

দিচ্ছি, তুই বোস।

আমি অনু আপার বসার ঘরে বসে রইলাম। অনু আপা অদৃশ্য। এদের বাড়িটা এজমালি। তিন ভাই এবং দুববানের মধ্যে ভাগ হয়ে অনু আপাদের ভাগে দুতলার একটা বড় ঘর, একতলার দুখানা ছোট ঘর এবং দুতলার বারান্দার খানিকটা অংশ পড়েছে। দুতলার বড় ঘরটা দুভাগ করে বসার এবং শোবার ঘর করা হয়েছে। বারান্দায় রান্নার ব্যবস্থা। বিয়ের আগে বলা হয়েছিল সমস্ত বাড়িটাই আমার দুলাভাইয়ের। বাবাকে তারা বাড়ি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়েছে। বাবা আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে আমাদের এসে বলেছেন, রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি! বিরাট খানদানী ব্যাপার।

অনুর কপাল ফিরে গেল।

এই নে বীরু, খা।

অনু আপা প্লেটে করে দুখানা ভাজা ইলিশমাছের ডিম নিয়ে এল।

গরম-গরম ভেজেছি, খেয়ে ফে। টপ করে মুখে ফেলে দে।

টপ করে ফেলা যাবে না, আগুন-গরম। চামুচ আন, ধীরে সুস্থে খাই।

অনু আপা প্লেট নামাবার সঙ্গে-সঙ্গে অন্য হাতে অতি দ্রুত আমার পকেটে টাকা। চালান করে দিল। এর মানে দুলাভাই বাড়িতেই উপস্থিত।

দুলাভাই বাসায়?

হুঁ। অফিসে যায় নি। বীরু, ময়না ভাই, তুই ওকে রাগিয়ে দিস না।

আরে পাগল, আমি রাগাব কেন?

তুই ইচ্ছা করে ওকে রাগাস, পরে খুব যন্ত্রণা করে।

যন্ত্রণা করলে তুমিও যন্ত্রণা করবে। তোমাকে একটা চড় দিলে তুমি একটা চড। লাগাবে। সে যদি বাঁ পায়ে লাথি বসায় তুমি বসাবে ডান পায়ে। ফ্রিস্টাইল পদ্ধতি।

আস্তে কথা বলতো।

আমি উঠি আপা, অনেক কাজ।

ওর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবি কী যে অদ্ভুত কথাবার্তা তুই বলিস ও রাগ করবে না।

ঠিক আছে, বসছি। পাঠাও দুলাভাইকে। তোমার পুত্র কোথায়।

শাশুড়ির কাছে আছে। নিয়ে আসব?

কোনো দরকার নেই। শিশু জিনিসটাই আমার অসহ্য।

দুলাভাই হাসিমুখে ঢুকলেন। দু-এক দিনের মধ্যে চুল কাটিয়েছেন বলে মনে হল। দেখাচ্ছে অবিকল বানরের মত। যতই দিন যাচ্ছে লোটার চেহারা ততই কুৎসিত হচ্ছে। রহস্যটা কী, কে জানে।

বড় শ্যালক, খবর কি?

খবর ভালোই।

শ্বশুরসাহেবের অসুখ শুনলাম। সিরিয়াস নাকি?

না, সিরিয়াস কিছু না। আপনাকে এমন অদ্ভূত লাগছে কেন দুলাভাই? চুল কেটেছেন নাকি?

হুঁ। বেশি ছোট করে ফেলেছে। খুব খারাপ লাগছে?

লাগছে। বদরের মতো দেখাচ্ছে। দিন সাতেক ঘর থেকে বেরুবেন না। ঘরেই থাকুন। ঘরে বসে কাটলা খান।

কথাগুলো মুখ ফসকেই বলে ফেললাম। দুলাভাই সামনে থাকলে আমার নিজের উপর কোনো কন্ট্রোল থাকে না। কঠিন-কঠিন কথা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বলতে থাকি। আজকের ঠাট্টাটা মনে হচ্ছে একটু কড়া হয়ে গেছে। দুলাভাইয়ের মুখ থমথমে। ভাস্যিস অনু আপা সামনে নেই। থাকলে সে কী করত কে জানে। হয়তো কেঁদে-টেদে ফেলত। তবে দুলাভাই ব্যাপারটা ভালোই হজম করলেন। স্বাভাবিকভাবেই বললেন, অসুখের খবর দেবার জন্যে এসেছ, না অন্য কোনো উদ্দেশ্য?

আরেকটা উদ্দেশ্যও আছে। আপনার কাছে কিছু টাকা হবে দুলাভাই?

কিছু মানে কত?

এই ধরুন হাজার পাঁচ।

মাথা খারাপ হয়েছে? দশ-বিশ হলে দিতে পারি।

বেশ, তাই না হয় দিন।

দুলাভাই বিরস মুখে একটি কুড়ি টাকার নোট বের করলেন। আমি বললাম, উঠি দুলাভাই?

এই বাড়িতে ঢাকা এবং বের হওয়া দুইই বিরক্তিকর। নানান ঘর-দুয়ার পার হতে হয়। অপরিচিত সব মহিলারা সামনে পড়ে যায়। তারা এমনভাবে তাকায়.... বিশেষ করে দুলাভাইয়ের এক বোন মলিনা না ফলিনা কী যেন নাম। আমার সঙ্গে তার অনেক বারই

দেখা হয়েছে। দেখা হওয়ামাত্র সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়,ভূ কোঁচকায়। সামনে থেকে বিশ্রী ভঙ্গিতে উঠে চলে যায়। এ রকম ভাবে উঠে যায়, যে নিজিকে খুব ছোট মনে হয়।

আজও বেরুবার সময় মেয়েটিকে দেখলাম। বারন্দায় মোড়ায় বসে আছে, হাতে মোটা একটা বই। আমাকে দেখেই সে বই বন্ধ করে চোখ কুঁচকে ফেলল। যেন মহা বিরক্ত। অনু আপা আমাকে এগিয়ে দিতে আসছিল। আমি উঁচু গলায় বললাম, আপা, তোর শ্বশুরবাড়ির সবার মুখ কেমন যেন লম্বাটে। ছুঁচোর মতো। তোর পুত্রও এ রকম হয়েছে। ব্যাপারটা কি বল তো?

বলেই আমি আর দাঁড়ালাম না। লম্বা-লম্বা পা ফেলতে শুরু করলাম। মনে-মনে আশা করছি ঘাটা ঠিক জায়গায় গিয়ে লাগবে। একবার পিছন ফিরে দেখতে পারলে হত। সাহসে কুলুচ্ছে না।

মাথার উপর রোদ চড়চড় করছে।

কোথায় যাওয়া যায়? ভর-দুপুরে যাবার মতো জায়গা আমার খুব বেশি নেই। শহীদুল্লাহ হলের দিকে যাওয়া যায়। রমিজের কাছে। রমিজ তার নিজের রুমেই রান্না-বান্না করে। ভালোই করে। রুমভর্তি রান্না-বান্নার আয়োজন। শিলপাটা পর্যন্ত আছে। একটা কাজের মেয়ে মাঝেমাঝে এসে মশলা পিশে দিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর চমৎকার সব ব্যবহার হচ্ছে। কোনো কোনো রুম ভাড়া দেওয়া হয়েছে বাইরের ব্যাচেলর চাকুরিজীবীদের কাছে। তারা দিব্যি মাসের পর মাস থাকছে। ভাড়া, ছাত্রদের কোনো একটা বিশেষ দলের কাছে চলে যাচ্ছে। সুন্দর সিসেটম!

রাহাজানিছিনতাইয়ের দল তাড়া খেলে ঢুকে পড়ছে হলে। হল হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র জায়গা। এখানে পুলিশ ঢুকবে না। যে-কেউ এখানে কিছু দিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে।

রমিজকে তার ঘরে পাওয়া গেল। আমি বললাম, রান্না কী?

রমিজ বিরক্ত মুখে বলল, ইলিশ-সর্ষে। তুই ঠিক খাওয়ার আগে আগে আসিস কেন বল তো? ভাত সর্ট পড়বে।

পড়ুক।

গোসল করবি? গোসল করলে সেরে আয়। খিদেয় প্রাণ যাচ্ছে এক্ষুনি ভাত নিয়ে বসব।

হলের গেটের সামনে তুমুল হৈচৈ হচ্ছে। ফট করে একটা ফাঁকা গুলি হল। এক জন হকিষ্টিক নিয়ে দৌড়াচ্ছে। হকিস্টিকের মতো অচল অস্ত্র নিয়ে এই বেকুব কী করছে, কে জানে। আমি বললাম, গোলমাল হচ্ছে কিসের? কোনো সমস্যা আছে? রুম ভাঙাভাঙি হবে?

না, অন্য ব্যাপার। তেমন কিছু না। একটা গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে। মালিককে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। আটক আছে। টাকা দিলে ছাড়া হবে।

কোন পার্টি ধরল?

জানি না। জাগ্রত ছাত্র সমাজ হবে। বেচারার অবস্থা কাহিল। হেভি মারধোর হচ্ছে।

স্যাররা আসছেন না।

পাগল হয়েছিস। স্যাররা এখন বেরুবে? সব ঝামেলা মিটলে দু-এক জন উঁকি দেবে। জাগ্রত ছাত্র সমাজকে ধমক দেবে, এমন সাহস কোনো স্যারের নেই। সব ভেড়ুয়া। ঝামেলা লাগলে স্ত্রীর আঁচলের বাতাস খায়।

অ্যাক্সিডেন্টে যে আহত হয়েছে, সে হলের ছাত্র নয়। বাইরের লোক। সে বাড়ি চলে গেছে। গাড়িওয়ালাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে। এই ক্ষতিপূরণ কার কাছে যাবে কেউ জানে না।

আমি বন্দিকে এক নজর দেখতে গেলাম। ঠোঁট কেটে বিশ্রী অবস্থায় চোখ রক্তবর্ণ। সে খালিগায়ে শুধুমাত্র একটা আন্ডারওয়ার পরে বসে আছে। লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল, আমি কিছুই করি নি। ফকির কিসিমের একটা লোক লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে পড়ে গেছে। আমার অপরাধ কি বুঝলাম না। আর অপরাধ যদি হয়ে থাকে, বিচার হবে। আইন আছে। আদালত আছে।

এক জন ছাত্র এগিয়ে এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে কর্কশ গলায় বলল, মানুষ মেরে বড়-বড় কথা। আইন দেখায়।

মানুষ তো মরে নি ভাই।

চুপ থাক।

আপানারা কী করতে চান? মেরে ফেলতে চান?

চুপ থাক শালা। কুড়ি হাজার টাকা ফেল, তারপর কথা। সন্ধ্যার মধ্যে কুড়ি হাজার না পাওয়া গেলে পেট্রল দিয়ে গাড়ি পুড়িয়ে ফেলব। এই, পেট্রল নিয়ে আয়। মানুষ মেরে কথা বলে।

যান, গাড়ি পুড়িয়ে ফেলুন। একটা পয়সা দেব না।

তোর বাপ দেবে।

সাট আপ।

রোগামতো একটি ছেলে এসে আচমকা লোকটিকে একটা ধাক্কা দিল। সে গড়িয়ে পড়ে গেল। আমি সরে এলাম। সময় বদলে যাচ্ছে, এইসব এখন তুচ্ছ মনে হয়। কিছু দিন পর হয়তো দেখব পকেটমার ধরা পড়েছে—তার চোখ তুলে ফেলা হচ্ছে। ছেলেবুড়ো খুব আগ্রহ নিয়ে সেই দৃশ্য দেখছে। ঘন-ঘন হাততালি পড়ছে। এর নাম সময়। সময়কে গাল দেওয়া যাবে না। তোমরা সময়কে গাল দিও না। আমিই সময়। স্বয়ং আল্লাহ্ এই কথা বলেছেন। সময়কে কোনো দোষ দেয়া যাবে না।

ভাত খেতে খেতেই বুঝতে পারলাম একটা মিটমাট হয়েছে। লোকটা চলে যাচ্ছে। তাকে একজন কে নিতে এসেছে। লোকা তাঁর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তার দৃষ্টি ভাবলেশহীন। এক জন ছাত্র বেশ মাইডিয়ার ভঙিতে বলল, গাড়ি ঠিকমতো বুঝে নিন, গাড়িতে টাচ করা হয় নি। যেমন ছিল তেমন আছে। নিন চাবি। এরপর থেকে গাড়ি সাবধানে চালাবেন। পাবলিকের হাতে পড়লে জান শেষ করে দিত। আমরা ধরে নিয়ে এসেছি বলে বেঁচে গেলেন।

লোকটি একটি কথারও জবাব দিচ্ছে না।

রমিজ বলল, সর্ষে-বাটা কেমন লাগছে? ভালো।

পাঁচফোড়ন ছিল না। পাঁচফোড়নের একটু টাচ দিলে দেখতি কী হত।

আমি অবাক হয়ে জিমকে লক্ষ করলাম। একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনা তাকে মোটও স্পর্শ করে নি। সে ঐ প্রসঙ্গে কোনো কথাই বলছে না।

বীরু।

কী

এশা তোক খুজছিল। খুব নাকি দরকার। আমার কাছে এসে তোর বাসার ঠিকানা চাইল।

বাসার ঠিকানা তো জানে। তোর কাছে আসার দরকার কি?

কীভাবে যেতে হয় জানে না। ডিরেকশন দিয়ে দিলাম। মসজিদের পাশে গলি। বাড়ির সামনে শিউলি গাছ। ঠিক আছে না?

আমাকে খুঁজছে কেন?

জানি না। বোধহয় এইবার প্রেম করতে চায়।

রমিজ গলা টেনে-টেনে হাসছে। এক সময় হাসি থামিয়ে বলল, অন্য কোনো ব্যাপারও হতে পারে। একটু চিন্তিত চিন্তিত মনে হল।

আমি বললাম, এশার কথা থাক। পরীক্ষার ডেট পড়েছে?

হুঁ।

হুঁ মানে? সত্যি পড়েছে?

ইয়েস। সামনের মাসের সাত, আট আর নয়। তোর রোল নম্বর আগের দিকে, তোর সাত তারিখে হয়ে যাবে।

এই খবর এতক্ষণে দিচ্ছিস!

ইম্পর্টেন্ট খবর না, কাজেই দিচ্ছি না। ডেট পিছাবে। আবার নতুন ডেট পড়বে। ইতিমধ্যে কোনট-একটা গণ্ডগোল হবে। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। তুই নিশ্চিন্ত মনে এশার সঙ্গে চালিয়ে যা। বন্ধু, তুমি এগিয়ে চল, আমরা আছি তোমার সাথে।

রমিজ শব্দ করে হাসতে লাগল। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, শুধু শুধু হাসছিস কেন?

হাসি আসছে, কাজেই হাসছি। তোর কাঁদতে ইচ্ছে হলে কাঁদতে পারিস। নো প্রবলেম।

হাত ধোবার সময় দেখলাম হলের প্রভোস্ট সাহেব আসছেন। হাসিহাসি মুখে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলছেন। ছোটখাটো মানুষ। ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিতে চমৎকার লাগছে। আটক

করা গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, এই আনন্দেই তিনি উল্লসিত। এক জন ছাত্র বলল, মানুষ মেরে পার পেয়ে যাবে, তা তো হয় না স্যার। কী বলেন?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

প্রভোস্ট সাহেব তৃপ্তির হাসি হাসছেন। তিনি ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে গেছেন। এরচেয়ে বড় সুসংবাদ কিছু হতে পারে না। এই সময়ে কেউ ঝামেলা সহ্য করতে পারে না। সবাই চায় ঝামেলাবিহীন দিন। প্রভোস্ট সাহেবের সঙ্গে দু জন চ্যাংড়ামত স্যার। তাঁদের চোখে-মুখে গভীর বিতৃষ্ণা, অথচ হাসিমুখে কথা বলতে চেষ্টা করছেন।

৫. হলে মন টিকল না

হলে মন টিকল না। আবার বেরুম। এই সময় কোথাও মন বসে না।

যাবার জায়গা ঠিক করা নেই। খানিকক্ষণ হাঁটাহাটি করব। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ যদি কোথাও যাবার ইচ্ছা জাগে, তখন দেখা যাবে।

কড়া রোদ। আগুন-গরম বাতাস বইছে। রাস্তাঘাট ফাঁকা। ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে, কারণ রাস্তার পিচ গলে আঠালো হয়ে আছে। স্যান্ডেলের সঙ্গে বেঁধে যাচ্ছে।

কড়া রোদে পথে নামলে অবধারিতভাবে আমার এশার কথা মনে হয়। তার সঙ্গেই রোদে হাঁটাহাঁটির ব্যাপারটা আমার রপ্ত হয়েছে। একদিন সে হঠাৎ এসে বলল, হাঁটতে তোমার কেমন লাগে?

খুব খারাপ। গাড়ি নেই এবং রিকশা ভাড়া নেই বলেই হাঁটি।

কড়া রোদে কখনো হেঁটে দেখেছ?

দেখব না কেন?

উঁহু, শখের হাঁটা না। দু ঘন্টা তিন ঘন্টা অনবরত হাঁটা। অদ্ভুত। অপূর্ব প্রথম কিছুক্ষণ খারাপ লাগবে। কান ঝাঁঝাঁ করবে। চোখে ঝাপসা দেখবে। তারপর দেখবে অন্যরকম লাগছে। সম্পূর্ণ অন্যরকম।

অন্যরকম মানে?

অন্যরকম মানে হচ্ছে–অন্যরকম। এস, আজ পরীক্ষা হয়ে যাক। নিজেই দেখ।

পাগল! আমি এই রোদে বেরুচ্ছি না। সান স্টোক হয়ে যাবে। এম এ পাশ করবার। আগে মারা গেলে বাবা-মা শোকে হার্টফেল করবেন। তারা এম এ পাশ পুত্র দেখতে চান।

তুমি এস তো আমার সঙ্গে।

যেতে হল। এশাকে অগ্রাহ্য করার মতো সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই আমার নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, সত্যি-সত্যি অন্যরকম লাগল। মনে হল অপরিচিত কোনো শহরে আমরা চলে এসেছি। যার সবকিছুই অন্যরকম। ক্রমাগত তিন ঘন্টা হেঁটে বাসায় ফিরেই জ্বরে পড়লাম। জ্বরের মধ্যে মনে হত হাঁটছি। শুধুই হাঁটছি। সেই জ্বর সারতে এক সপ্তাহ লাগল।

এর পরেও এশার সঙ্গে গিয়েছি। ভরদুপুরেই যাওয়া। পুরোনো ঢাকার গলিতে-গলিতে হেঁটেছি। আমার ক্লান্তি লাগলেও তার ক্লান্তি নেই। আমি যদি বলি, চল, কোথাও বসে একটু রেস্ট নিই। এশা অবাক হয়ে বলে, এখনই টায়ার্ড? সবে তো যাত্রা শুরু।

প্লিজ, আর পারছি না।

চল, তাহলে, কোনো চায়ের দোকানে বসি।

কত বিচিত্র ধরনের চায়ের দোকানে এশাকে নিয়ে গিয়েছি। রাস্তার পাশে বট গাছের নিচে, সিঁড়ির নিচের খুপরিতে। একবার এক চায়ের দোকানি বলল, এইখানে মেয়েছেলে নিয়ে আসা যাবে না। অন্যখানে যান।

এশা বলল, মেয়েছেলে কী দোষ করল?

অসুবিধা আছে।

অসুবিধাটা কী সেটা বলুন। না বললে আমি যাব না। চিৎকার দেব।

দোকানদার বিস্মিত হয়ে বললে, চিৎকার দিবেন? চিৎকার দিবেন ক্যান?

আমাকে বসতে দিচ্ছেন না, এই জন্যে চিৎকার দেব। যে-সব জায়গায় ছেলেরা বসতে পারে সেখানে মেয়েরাও যেতে পারে। সমান স্বাধীনতা।

দোকানী বিরক্ত হয়ে বলল, আসেন, বসেন। চা খাইয়া বাড়িত যান।

সেই চায়ের দোকানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় লাগিয়ে আমরা চা খেলাম। এশা নানান কথা নিচু গলায় বলতে বলতে হাসতে লাগল। এ সব সে করছে দোকানদারকে রাগিয়ে দেবার জন্য। দোকানদারটা সত্যি-সত্যি রাগীরাগী চোখে তাকাচ্ছে? কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সে আমাদের কাছ থেকে চার কাপ চায়ের দাম নিল না। আমি বললাম, চায়ের দাম নেবেন না কেন?

আমার ইচ্ছা আমি নিমু না। বড় যন্ত্রণা করছেন। অখন যান, বিদায় হন।

এর পরেও আমরা অনেকবার গিয়েছি। দোকানি প্রতিবারই বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনোবার পয়সা নেয় নি। কেন নেয় নি কে জানে! সব মানুষের মধ্যেই অনেক রকমের রহস্য থাকে।

৬. রোদের তেজ মরে আসছে

রোদের তেজ মরে আসছে। এখন আর হাঁটতে ভালো লাগছে না। ঐ চায়ের দোকানটায় গেলে কেমন হয়? এক কাপ চা এখন নিশ্চয়ই খাওয়া যেতে পারে। আজ সে পয়সা নেবে কি না কে জানে। হয়তো নেবে। এশা সঙ্গে থাকলে নিত না। এই পরীক্ষাটাও হয়ে যাক। এশাবিহীন অবস্থায় কী হয়।

চায়ের দোকানির নাম রমজান। গোলগাল মুখ, মাথাভর্তি বাবরি চুল। চোখ দুটি আরো বড়-বড় হলে মধ্যবয়সের কবি নজরুল হিসেবে চালিয়ে দেয়া যেত। রমজান আমার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকাল। হাই তুলে বলল, মুনশি, ইনারে চা দে।

চা খাবার সময় লক্ষ করলাম, সে একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। একটা টাকা দিলাম চায়ের দাম। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে ক্যাশবাক্সে রেখে দিল। আমি বললাম, এশ কি এর মধ্যে এসেছিল? ঐ যে মেয়েটা আসে আমার সঙ্গে—রোগা, লম্বা, কাঁধে সব সময় একটা ব্যাগ।

আসে মাঝে-মইধ্যে।

একা?

না, চশমাওয়ালা একজন থাকে সাথে।

ছেলে না মেয়ে?

ছেলে। সুন্দর মতো একজন।

এই বলেই রমজান একটা উপহাসের হাসি হাসল। বোধহয় সে ভেবেছিল এটা শোনার পর আমি উ বলে চিৎকার করে বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ব। রমজান তাকাচ্ছে ট্যারা চোখে। আমি বললাম, চশমা পরা ছেলে? খুব ফর্সা?

হ।

ও হচ্ছে তার স্বামী। ওর নাম মুনীর।

রমজানের মুখ এবার হাঁ হয়ে গেল। এটা শোনার জন্যে সে বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। মানুষকে পুরোপুরি বেকুব বানানোর একটা অন্যরকম মজা আছে। কেমন ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে ব্যাটা।

উনার বিহা হইছে?

হবে না? বয়স তো কম হয় নি! একটা ছেলে আছে, দু বছর বয়স—মন্টু নাম।

আফনে উনার কে হন?

কেউ হই না। খাতিরের লোক।

লোকটির দিকে তাকিয়ে চোখ টেপার একটা ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পারা গেল না। এই টেকনিকটা শিখতে পারি নি। চোখ টিপলে দুচোখ একসঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়।

আমি বেরিয়ে এলাম। রমজান ব্যাটাকে পুরোপুরি বেকুব বানানো যায় নি। সে গল্পটি বিশ্বাস করে নি। একটা ছেলে আছে বলে আমি ঘটনাটা কাঁচিয়ে ফেলেছি। ঐটা না বললে সে বিশ্বাস করত।

বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা কথা বলা খুব কঠিন কাজ। আমার চেনাজানার মধ্যে এই কাজটা সবচে ভাল পারে মাসুম। মাসুমের চোখ বড়-বড়। সমস্ত চেহারায় ভালোমানুষি একটা ভাব আছে। সে চট করে নিজের চোখে পানি নিয়ে আসতে পারে। আমরা সবাই জানি মাসুমের স্বভাবই হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা। তবু সে যখন কিছু বলে আমরা সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বাস করে ফেলি।

একদিন থার্ড ইয়ারের ক্লাস হচ্ছে। নবী স্যার ক্লাস নিচ্ছেন। মাসুম দরজার সামনে এসে বলল, স্যার, একজন অ্যাকসিডেন্ট করেছে। পিজিতে আছে, খুবই খারাপ অবস্থা-ব্লাড দিতে হবে। বীরুকে একটু ছুটি দিন স্যার। বীরুর রিলেটিভ। বলতে-বলতে মাসুমের চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। নবী স্যারের মুখ অসম্ভব করুণ হয়ে গেল। তিনি আমাকে ক্লাস থেকে বাইরে নিয়ে এসে বললেন, ডিপার্টমেন্টের সামনে আমার গাড়ি আছে। ড্রাইভারকে আমার কথার বল, তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। দেশের কী যে অবস্থা, প্রাণ হাতে নিয়ে পথে নামতে হয়। যাচ্ছি কোথায় আমরা?

আমি নিজেও তখনো বুঝতে পারি নি যে ব্যপারটা পুরোপুরি রসিকতা। আমার হাত-পা কাঁপছে। আমি ধরেই নিয়েছি, এ আর কেউ না—নির্ঘাৎ বাবা, তিনি একটা কাণ্ড করেছেন।

রিকশা থেকে ঝাঁকুনি খেয়ে পড়ে গেছেন। তখন হয়তো পেছন থেকে একটা ট্রাক এসেছে। ঘাতক ট্রাক। শহর ভর্তি ঘাতক ট্রাকে।

রিকশা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাবার নামডাক আছে। বিনা ঝাঁকুনিতেও তিনি গড়িয়ে পড়ে যান। গত মাসেই এই কাণ্ড করে চশমা ভেঙেছেন। সাড়ে তিন শ টাকা লেগেছে চশমা সারাতে। এই টাকার চাপ সামলানোর জন্যে বাড়িভাড়া দেওয়া হয় নি। এখন চাপ দিচ্ছেন বাড়িওয়ালা। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যাতিন বেলা নিজে আসছেন কিংবা তাঁর ভাইস্তাকে পাঠাচ্ছেন। প্রতিবারই মা তাঁদের খুব সমাদর করছেন। চা-বিসকিট এইসব পাঠাচ্ছেন। দরজার আড়াল থেকে বলছেন, সামনের মাসের দুই তারিখে দু মাসেরটা একসঙ্গে মিটিয়ে দেব। এই মাসে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে। কিছু মনে করবেন না। এরকম তো কখনো হয় না। উনি বাড়িভাড়ার ব্যাপারে খুব সাবধান।

ইতং বিতং কত কথা মার। এইসব ঝামেলার কথাগুলি আমরা সবাইকে মাকে দিয়ে বলাই। পারুল একবার একটা ঝামেলা বাধালোপাড়ার নাটকে অভিনয় করবে। আমাদের গুষ্ঠিতে কেউ অভিনয়ের অ জানে না, কিন্তু সে পেয়ে গেল নায়িকার পার্ট। নাটকের নাম নয়া ফসল। খুবই বিপ্লবী জিনিস। মোড়ল-মারা নাটক। শেষ দৃশ্যে জাগ্রত জনতা গ্রামের মোড়লকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তখন নাটকের নায়িকা আলুথালু বেশে স্টেজের মাঝখানে ছুটে এসে বলে—এত অল্প রক্তে হবে না। চাই চাই, আরো রক্ত চাই। রক্তের নদী চাই, রক্তের সাগর চাই...ইত্যাদি।

রোজ রিহার্সেল। বিকেলে শুরু হয়, শেষ হতে হতে সন্ধ্যা। একদিন রিহার্সেলে কী হয়েছে কে জানে, পারুল কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল। নাটক করবে না। নাট্য নির্দেশক, রোজ

বাসায় এসে বসে থাকে। পারুল নিজে তার সঙ্গে কথা বলে না, মাকে পাঠায়। মা চিকন গলায় বলেন, ওর তো বাবা, গায়ে জ্বর। হামের মত গুটি-গুটি বের হয়েছে। ধীরেন বাবু ওষুধ দিচ্ছেন। তোমরা অন্য কাউকে দিয়ে নাটক করাও। ধীরেন বাবু বলেছেন—একে মাসখানিক রেস্ট নিতে হবে।

মাসুমের কথায় ফিরে যাই। ব্যাটা তো আমাকে বের করে নিয়ে এল। আমি ঠিকমতো পা পর্যন্ত ফেলতে পারছি না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি হাসপাতালের বেডে বাবা লম্বা হয়ে পড়ে আছেন। স্যালাইন-ট্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। মা ঘন-ঘন ফিট হচ্ছেন।

মাসুম বলল, তোর কাছে সিগারেট আছে?

তখন বুঝলাম, ব্যাপারটা রসিকতা। মাসুম গলা নামিয়ে বলল, নবী স্যারের গাড়ি নিয়ে যাবি?

কোথায়?

ইয়াকুবের বাসায়। রু দেখব। মারাত্মক জিনিস। খালি বাসা। আমি, তুই আর ইয়াকুব। গেলে চল, সময় নষ্ট করতে পারব না।

স্যারের গাড়ি নিয়ে আমরা পিজি পর্যন্ত গেলাম। ড্রাইভারকে বললাম, ব্যাংক ভাই, স্যারকে বলবেন বড় উপকার হয়েছে। আমরা প্রায় দৌড়ে পিজিতে ঢোকার একটা ভঙ্গি করলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্যি ইয়াকুবের বাসায় যাওয়া হল না। মাসুম উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। কোন পরিকল্পনাই সে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

পিজি থেকে বের হয়ে পাশের একটা দোকানে ঢুকে লাচ্ছি খেলাম। লাচ্ছি শেষ করবার পরপরই মাসুম হাই তুলে বলল, দূর, ভালো লাগছে না, বাসায় চলে যাব। ঘুম আসছে।

তুই আমাকে খামোখা ক্লাস থেকে বের করে নিয়ে এলি কেন?

এখন চলে যা, তা হলেই তো হয়! ঘ্যানঘ্যান করছিস কেন?

ইডিয়ট।

তুই শালা আরো বড় ইডিয়ট।

আমাকে আর দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মাসুম লম্বা-লম্বা পা ফেলে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল। শিস দিয়ে কী একটা গান গাইছে-ইয়ে মেরা সাংদিল। সাংদিল ব্যাপাটা কী কে জানে।

আমার তেমন কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। মাসুমকে মাঝেমাঝে বন্ধু বলে মনে হয়। সেটা বোধহয় ঠিক নয়। সে সবারই বন্ধু—বিশ্ববন্ধু। প্রথম দিনের আলাপেই সে তুমিতে চলে যায়। এবং অবলীলায় বলে—একটা টাকা যদি থাকে দাও তো! বাসভাড়া নেই। অল গন। দ্বিতীয় দিন দেখা হলে সে তুই সম্বোধন করে। এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকা চায়। দিতে না-চাইলে পা ধরতে আসে।

এশার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় মাসুমের মাধ্যমে। টিএসসিতে গিয়েছি কি একটা কাজে, আমাকে দেখে মাসুম ছুটে এল, দোস্ত, আমাকে উদ্ধার কর। গভীর সমুদ্রে পড়েছি। ডিপ ওয়াটার।

কী হয়েছে?

একটা মেয়েকে কবি শামসুর রাহমানের বাসায় নিয়ে যা। আমার নিয়ে যাওয়ার কথা। যেতে পারছি না। আটকা পড়ে গেছি।

শামসুর রাহমান সাহেবের বাসা কোথায়?

আমি কী করে জানব কোথায়? কবি-সাহিত্যিকদের খোঁজ আমি রাখি নাকি। ঐসব হচ্ছে হাই থটের ব্যাপার।

ঐ মেয়েও কি হাই থটের নাকি?

আরে দূর দুর। কবিতা লিখেছে—পড়াতে চায় শামসুর রাহমান সাহেবকে। ভাই। তোর পায়ে ধরছি, নিয়ে যা রিকশা ভাড়া দেব!

কবি-মেয়ে নিয়ে যাব। পথে কোন বিপদে পড়ি কে জানে? যদি কবিতা শোনাতে চায়?

আরে দূর দূর, মেয়েমানুষ আবার কবি হয় নাকি? আয় পরিচয় করিয়ে দিই—ঐ দেখ পিচপিচ করে থুথু ফেলছে। কী সুন্দর করে থুথু ফেলছে দেখছিস? এই মেয়ের থুথু ফেলা দেখেই যে-কোনো ছেলে ওর প্রেমে পড়ে যাবে। কি, প্রেম-প্রেম লাগছে। না।?

আমি মাসুমের সঙ্গে এগুলাম। মাসুম হাসিমুখে বলল, এশা, আমার এই বন্ধু তোমার প্রেমে পড়ে গেছে। গভীর প্রেম।

এশা মাথার চুল ঠিক করতে করতে বলল, কী দেখে প্রেমে পড়ল?

তোমার থুথু ফেলা দেখে। কাইন্ডলি আরেকবার ফেল।

এশা সত্যি-সত্যি থুথু ফেলল। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, আরো ফেলতে হবে, না একটাতেই হবে? আমি জবাব খুঁজে পেলাম না। ধারালো, অথচ সুন্দর জবাব চট করে মাথায় আসে না। আসে অনেক পরে। এশার এই প্রশ্নের তিনটি চমৎকার উত্তর পরদিন আমার মাথায় এসেছিল, অথচ সেই সময়ে বোকা ধরনের একটি হাসি দিয়ে মাসুমের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেললাম। মাসুম সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে বলল, বীরু তোমাকে কবির বাড়িতে নিয়ে যাবে। বিখ্যাত লোকজনদের বাড়িঘর ওর মুখস্থ। এই বলেই সে হাওয়া।

কবির বাসা খুঁজে পেলাম না। আমি নিজেই অবশ্য বাসা খুঁজে পাবার ব্যাপারে তেমন কোনো উৎসাহ দেখাই নি। হয়তো বাসায় যাব, ভদ্রলোক কথাই বলবেন না। কিংবা মেয়েটির মুখের উপর বলবেন কিছু হয় নি। কবিতা চট করে লেখা যায় না। সাধনা দরকার। বেশি বেশি করে কবিতা পড়বে। চিন্ত করবে। চোখ-কান খোলা রাখবে। কবিরা উঠতি কবি দেখলেই চমৎকার একটা ভাষণ দেন। সেই ভাষণ শুনলে গা-জ্বালা করে। বলতে ইচ্ছ করে দূর শালা, কবিতাই লিখব না।

এটা অবশ্যি আমার কথা না। মাসুমের কথা। সে নাকি এরকম একটি ভাষণের পর এক কবিকে এই কথা বলে চলে এসেছিল। মাসুম একজন উঠতি কবি। এশার সঙ্গে সেই সূত্রেই খাতির। কবিতে-কবিতে ধুল পরিমাণ।

কবির বাসা খুঁজে না পেয়ে ফিরে আসছি। এশা বলল, আপনি কি কবিতা পড়েন?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ কিছুই পড়ি না। পড়বার ইচ্ছাও নেই।

এশা খিলখিল করে হেসে উঠল। আরো অনেকের মতে আমিও হাসি শুনেই এশার প্রেমে পড়ি। ওর থুথু ফেলা দেখে নয়। এত সুন্দর করে যে কেউ হাসতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।

৭. মাসুমের খোঁজে

মাসুমের খোঁজে গেলে কেমন হয়?

ব্যাটা থাকে সব সময় বাইরে-বাইরে, কিন্তু আমি যে কবার তার বাসায় গিয়েছি তাকে পেয়েছি। তার বাসায় যাওয়াও খুব সোজামগবাজারের বাসে উঠে পড়লেই। হয়। টঙ্গি ডাইভারশান রোডে নেমে দক্ষিণ দিকে মিনিট দশেক হাঁটা।

যাব নাকি মাসুমের কাছে? নাকি বাসায় ফিরে যাব? নাকি দুটার কোনোটাই না-করে অন্য কোথাও যাব? মাসুমের কাছে গেলে সময়টা অবশ্যি ভালো কাটবে। সত্যি-মিথ্যা মেশানো মজার-মজার কিছু গল্প শোনা যাবে। এবং এশার ব্যাপারেও হয়তো কিছু জানা যাবে।

মাসুমকে বাসায় পাওয়া গেল না। তার মামা ঘর থেকে বেরুলেন। খুবই অভদ্র গলায় বললেন, তুমি কে?

অন্য কেউ হলে আমি নরম গলায় বলতাম, আমি একজন মানব-সন্তান। কিন্তু এই ভদ্রলোককে এটা বলা যাবে না। তিনি মাসুমের একমাত্র গার্জিয়ান। বড় সরকারী চাকরি করেন। জয়েন্ট সেক্রেটারি বা এই জাতীয় কিছু। এঁকে চটিয়ে দেবার কোনো অর্থ হয় না। আমি বিনীত গলায় বললাম, আমি ওর একজন ক্লাসফ্রেন্ড। বন্ধু বলতে পারেন।

কী রকম বন্ধু?

বেশ ভালো বন্ধু।

তোমরা কি রকম বন্ধুবান্ধব এই জিনিসটা আমাকে বল।

ব্যাপারটা কী, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

আজকের খবরের কাগজ দেখ নি? তোমার বন্ধুর ছবি ছাপা হয়েছে। ফ্রন্ট পেইজে ছবি।

আমি খবরের কাগজ পড়ি না।

ভালো কথা। খুব ভালো কথা। আমি ভেবেছিলাম খবরের কাগজ পড়ে তারপর এসেছ। নাও, এইখানে আছে। আগে পড়, তারপর কথা বল।

খবরটা পড়লাম। ছবিও সত্যি-সত্যিই ছাপা হয়েছে। তবে বলে না দিলে বোঝা মুশকিল যে, এ মাসুম। আরো তিনটি ছেলে এবং গোটা দশেক মেয়ের সঙ্গে তোলা গ্রুপ ছবি। অসামাজিক কার্যকলাপের জন্যে পুলিশ এদের ধরেছে।

পড়লে নিউজটা?

জ্বি, পড়লাম।

আমার বাবা ছিলেন মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল। সারাজীবনে একটা মিথ্যা কথা বলেন। নি। এক ওয়াক্ত নামাজ কাজ করেন নি। কারোর কি এই ঘটনা জানতে বাকি থাকবে, তুমিই বল! সারা বাংলাদেশের লোক এই ছবি দেখবে না?

সব পত্রিকায় ছাপা হয়েছে?

না, এই একটাতেই ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটাই হচ্ছে ফাজিল ধরনের। আজেবাজে নিউজ দিয়ে ভর্তি থাকে। এই নিউজ কি ফার্স্ট পেইজে আসার মতো নিউজ? নিউজ করেছিস করেছি, এত বড় একটা ছবি দেয়ার দরকার কি?

আমি সান্তানার সুরে বললাম, মাসুমকে কিন্তু ছবিতে চেনা যাচ্ছে না। আপনি বলে না-দিলে চিনতে পারতাম না।

ভদ্রলোক কিছুটা আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল। গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বললেন, তোমার অনার্সের রেজাল্ট কি?

এটা হচ্ছে আমাকে যাচাই করবার একটা চেষ্টা। আমি কী ধরনের ছাত্র। মাসুমের লেভেলের না উঁচু লেভেলের সেটা জেনে নেওয়া।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, খুব একটা ভালো করতে পারি নি। অবশ্যি ফার্স্ট ক্লাস ছিল। এই সরল মিথ্যাটি বললাম ভদ্রলোককে আরো ঠাণ্ডা করে দেবার জন্যে। আশা করা যাচ্ছে মাসুমের প্রতিও তিনি খানিকটা সদয় হবেন। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলে তার ভাগ্নের বন্ধু, কাজেই ভাগ্নে খুব-একটা খারাপ হতে পারে না।

ফার্স্ট ক্লাস ছিল?

জ্বি।

গুড, ভেরি গুড। ভোমরা থাকতে পর এই অবস্থা কেন বল দেখি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। ঘরে আমার বড়-বড় মেয়ে। খবরের কাগজ তো তারাও পড়েছে। কি ভাবছে কে জানে। তুমি বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

আমি বসলাম।

বেলের সরবত খাবে? আমার স্ত্রী বানাচ্ছে। খাও একটু। পেট ঠাণ্ডা থাকবে। খুব উপকারী জিনিস।

তের-চৌদ্দ বছরের সুন্দর একটা মেয়ে এসে বেলের বরবত দিয়ে গেল। মাসুমের মামা অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগলেন, আমার স্ত্রী কমপ্লেইন করত, সে প্রায়ই নাকি মাসুমের মুখ থেকে মদের গন্ধ পায়। উল্টা আমি তাকে ধমক দিতাম। আমি বলতাম—মদের গন্ধ তুমি চেন নাকি? এখন তো মনে হচ্ছে সবই সত্যি! গাঁজাটাজাও বোধহয় খায়।

জ্বি-না, গাঁজা খায় না।

খায়, খায়। একদিন আমি নিজে তার ঘরে ঢুকে বিকট গন্ধ পেলাম। নাড়ি উল্টে আসে।

সস্তা সিগারেট খায় তো! ঐ সিগারেটের গন্ধ। নন-স্মোকারদের কাছে ঐ গন্ধই মনে হয় গাঁজার গন্ধ।

তাইবা খাবে কেন? নেশার পেছনে এই বয়সেই সে পয়সা খরচ করবে কেন? এ হচ্ছে আমার বড় বোনের ছেলে। অল্পবয়সে তিনটা বাচ্চা নিয়ে বোন বিধবা হল। সেভেন্টি

ওয়ানের বিধবা। সবাই ধরে-বেঁধে আবার বিয়ে দিল। এই হাজব্যান্ড বাচ্চাগুলি দেখতে পারে না। কী আর করব? আমরা ভাগাভাগি করে বাচ্চাগুলি নিয়ে নিলাম। এই হারামজাদাটা পড়ল আমার ভাগে। অথচ যখন প্রথম আনি তখন কী শান্ত ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদত।

আমি চুপ করে রইলাম। মাসুম সম্পর্কে এইসব তথ্য কিছুই জানতাম না। মাসুমের মামা বলছেনও বেশ সুন্দর করে। শুরুতে লোকটাকে যত খারাপ মনে হচ্ছিল,

এখন দেখছি তা নয়। লোকটা ভালো মানুষ।

মাসুম কি এখন হাজতেই আছে নাকি?

আরে না! হাজতে থাকবে কি! সকালে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছি। ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। আজ অফিস কামাই হয়ে গেছে।

ও গেছে কোথায়?

যাবে আবার কোথায়? মোড়ের চায়ের দোকানে বসে আছে। দুপুরে ভাত খাবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে, আসে নি। তেজ দেখাচ্ছে। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিলে তেজ কমবে। হারামজাদা।

মামা, আমি তাহলে উঠি–দেখি ওকে পাই কি না।

আমার মামা ডাকে ভদ্রলোক একেবারে গলে গেলেন। আমাকে এগিয়ে দেবার জন্যে গেট পর্যন্ত চলে এলেন। নিচু গলায় বললেন, বুঝিয়ে-সুজিয়ে পাঠিয়ে দিও। আর তোমার বন্ধু-বান্ধবরা সৎ পরামর্শ দিও। বাপ-নেই ছেলে। মাও তো বলতে গেলে নেই।

৮. মাসুম মুখ লম্বা করে বসে আছে

মাসুম মুখ লম্বা করে বসে আছে। আমাকে দেখে উঠে এল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল। তার সামনে চায়ের কাপ। চায়ে চুমুক দেয় নি। ভরা কাপে দুতিনটা সিগারেটের টুকরো ভাসছে। আমি তার সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, তুই তো বিখ্যাত হয়ে গেলি! ফ্রন্ট পেইজে ছবি চলে এসেছে।

মাসুম ফিক করে হেসে ফেলল। যেন আমার কথায় মজা পেয়ে গেছে। সে হাসিমুখেই বলল, পাকেচক্রে আটকে পড়ে গেলামরে দোস্ত। ভিক্টোরিয়া পার্কে ব্যাপারটা ঘটল। আমি দরদাম কী করে হয় ঐটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। দুই ধরনের মেয়ে আছে। এক ধরনের মেয়েদের হচ্ছে ফিক্সড় প্রাইস, অন্য আরেক ধরন আছে মাছের দামের মতো। দরাদরি হতে থাকে। আমি হাঁ করে দেখছি। ফট করে এসে পড়ল পুলিশ। কুড়িটা টাকা পকেটে থাকলে পুলিশের হাতে দিয়ে চলে আসতে পারতাম, কিন্তু এমনই কপাল, পকেটে পয়সা ছিল না।

আমি বললাম, পুলিশ কি তোকে ধোলাই দিল নাকি?

তেমন না। অল্পস্বল্প। পেটে একটা মাইল্ড ঘুসি। মুখেও দুএকটা মারলস ধরনের।

ঠোঁট তো মনে হচ্ছে ফাটিয়ে দিয়েছে। হাসতে এখন বোধহয় অসুবিধা হয়। হয় না?

তুই শালা রসিক আছিস। চা খাবি?

না।

এরা আফিং দিয়ে চা বানায়—খেয়ে দেখ এক কাপ। নেশা লেগে যাবে।

আফিং দিয়ে চা বানায় মানে?

কী-একটা যেন দেয়, খালি খেতে ইচ্ছা করে। আমি একবার পরপর আট কাপ চা খেয়েছি। তারপর দেখি মাথা ঘুরছে।

আবার মিথ্যা কথা বলছিস?

মিথ্যা বলব কেন?

তোর সামনেই তো এক কাপ চা পড়ে আছে। মুখেই তুলিস নি বলে মনে হচ্ছে।

মনটা ভালো নেই দোস্ত। মলিনার জন্যে খারাপ লাগছে। খুবই খারাপ লাগছে।

মলিনা কে?

ধরা পড়েছে আমাদের সাথে। বড় ভালো মেয়ে। কী রকম ঠাণ্ডা চেহারা। চোখগুলির উপর ছায়া পড়ে আছে, এরকম মনে হয়। আর গলার স্বর কী যে অদ্ভুত। শুধু শুনতে ইচ্ছে করে। অল্প কিছুক্ষণ ওর কথা শুনলে নেশা ধরে যায়, মনে হয় খালি কথাই শুনি।

তুই তো দূরে দাঁড়িয়ে দরদাম করা দেখছিলি। এত কথা শুনলি কখন?

হাজতে কথা হয়েছে।

হাজতে তো যতদূর জানি ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা-আলাদা রাখে।

মাসুম চুপ করে রইল। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

উঠি রে মাসুম। বাসায় যা, তোর মামা মনে হচ্ছে পেরেশান। বাসায় গিয়ে ভাতটাত খা।

মাসুম আমার সঙ্গে-সঙ্গে এল। নিচু গলায় বলল, এই কদিন আর কোথাও বেরুবটেরুব না। ভাইভার ডেট দিলে জানাবি। শিগগির দেবে নাকি?

দিয়ে দিয়েছে।

দিয়ে দিয়েছে মানে?

দিয়ে দিয়েছে মানে দিয়ে দিয়েছে। সাত, আট, নয়।

সে কী? তাহলে তো আন্দোলন করতে হয়।

কি আন্দোলন?

পরীক্ষা পেছানোর অন্দোলন। পাশ করে করবটা কী? বেকার হবার চেয়ে ছাত্র থাকা ভালো না? কত রকম ফেসিলিটি।

কি ফেসিলিটি?

মাসুম জবাব দিল না। বাস-স্ট্যান্ডে দুজন খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। মোটামুটি ফাঁকা বাস একটা দাঁড়িয়েছিল। সেটায় উঠলাম না। কেন উঠলাম না কে জানে। পরের বাসটায় হয়তো গাদাগাদি ভিড় থাকবে। ঠেলাঠেলি করে তাতেই উঠব। আমরা সবাই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছি। শুধু উল্টো কাজ করতে ইচ্ছা করে।

একটা মিছিল যাচ্ছে। নির্জীব ধরনের মিছিল। কোনোরকম উৎসাহ-উত্তেজনা নেই। কার চামড়া যেন তুলে নিতে চাচ্ছে, কিন্তু এমনভাবে বলছে যেন চামড়া তুলে নেয়াটা একটা আরামদায়ক ব্যাপার। মিছিলের পেছনে-পেছনে একটা পুলিশের গাড়ি। গাড়ির জানালায় মোটাসোটা একজন পুলিশ অফিসারের মুখ। ভদ্রলোককে খুবই ক্লান্ত মনে হচ্ছে। হাই তুলছেন।

মাসুম।

বল।

এশার সঙ্গে কি তোর ইদানীং দেখা হয়েছে?

পরশু হয়েছে।

ওর খবর কি বল তো?

খবর কিছু জানি না। সিরাজের সঙ্গে খুব খাতির জমিয়েছে।

সিরাজটা কে?

মালদার পার্টি, এশার একটা কবিতার বই বের করে দিয়েছে।

তাই নাকি?

হুঁ। আমার কাছে এক কপি বেচতে নিয়ে এসেছিল। পুশিং সেল। আমি বললাম–মাগনা দিলেও আমি এই বই নেব না।

সত্যি বই বের করেছে?

হুঁ।

আমার তো মনে হয় তুই আবার মিথ্যা কথা বলছিস।

মাঝে-মাঝে সত্যি কথাও বলি।

বইটার নাম কি?

নাম জানি না। আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

মাসুম আগ্রহ নিয়ে মিছিলের দিকে তাকাচ্ছে। মিছিল দেখলেই সে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে। এখনো করছে সম্ভবত। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ঢুকে পড়বে।

মাসুম পিচ করে এক দল থুথু ফেলে বলল, মাদি মার্কা একটা মিছিল বের করেছে। নেতাটাকে দেখছিস? পান খাচ্ছে, আঙুলে আবার চুন। এই শালা মিছিল করবে। কি? কিছু একটা করা দরকার বীরু।

কী করবি?

পুলিশের জীপে দুটা ইটের চাক্কা মারলেই খেল জমে যাবে। আয় না!

পাগল।

দেশটা কেমন ঝিম মেরে গেছে। উত্তেজনা নেই। ফায়ার নেই। ঐ শালা নেতার দিকে তাকিয়ে দে হারামজাদা এখন সিগারেট ধরাচ্ছে—দাঁড়া খেল জমিয়ে দিই। ভেলকি লাগিয়ে দেব। পটকা-ফটকা থাকলে ভালো হত।

আমি উদ্বিগ্ন গলায় বললাম, আমি বাসে উঠে বিদায় হয়ে নিই, তারপর যা ইচ্ছা করিস।

তাড়াতাড়ি চলে যা। হেভি গ্যাঞ্জাম লাগিয়ে দেব।

আমি দ্রুত বাসে উঠে পড়লাম। মাসুম চোখমুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে কাণ্ড কিছু একটা করবে। আমার বাস চলে না-যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে কি না কে জানে। আমি বাসের জানালা গলে হাত নাড়লাম। মাসুম দেখল কি না বুঝলাম না, মুখ শক্ত করে আগের মতোই দাঁড়িয়ে রইল। বাস ছেড়ে দিল। দেখতে দেখতে ঝড়ের গতি। প্রতিটি বাস এবং ট্রাকের ড্রাইভাররা সম্ভবত নিয়তিবাদী। যা হবার হবে এই রকম একটা

ভাব করে এক্সিলেটার চাপতে থাকে। সামনে বড় রকমের জটলা থাকলে হয়তোবা চোখ বন্ধ করে ফেলে। মতি মিয়া নামের একজন ট্র্যাক ড্রাইভারের সঙ্গে আমার খানিকটা আলাপ আছে। তার কাছে শুনেছি, ঢাকা শহর নাকি একজন কামেল আদমির কন্ট্রোলে আছে। সেই কামেল আদমির হুকুম ছাড়া কিছু হবার উপায় নেই। কাজেই সাবধান হয়ে ট্রাক চালালে যে-কথা, অসাবধান হয়ে চালালেও সেই একই কথা। আকসিডেন্ট হবার হলে হবেই।

সেই কামেল আদমির ঠিকানাও মতি মিয়া জানে। একদিন আমাকে নিয়ে যাবে, এরকম কথা আছে। ভেবে রেখেছি যাব। দেখে আসব। পৃথিবীতে দেখার জিনিসের শেষ নেই। অনেক কিছুই তো দেখলাম, একজন কামেল আদমিও দেখে আসি। মনে-মনে ভদ্রলোকের একটা চেহারাও কল্পনা করে রেখেছি। তিন মণের মধ্যে ওজন (এখন পর্যন্ত কোনো রোগা পীর আমার চোখে পড়ে নি। ঐশ্বরিক ব্যাপার-স্যাপার এবং শরীরের মেদ—এই দুয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বলে আমার ধারণা)। ভদ্রলোকের গা থেকে নিশ্চয়ই ভুরভুর করে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখে সুর্মা দেওয়ায় চোখ দুটি দেখাবে কোমল। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরও হবে মোলায়েম যাকে বলে সিকি ভয়েস। এঁদের সব কিছুই মোলায়েম থাকে। গলার স্বর মোলায়েম, কথাবার্তা মোলায়েম, শরীর মোলায়েম—শুধু অন্তরটি কঠিন। একাত্তুরে তাই দেখা গেছে।

বাস বড় রকমের একটা ঝাঁকুনি খেয়ে হঠাৎ চলতে শুরু করল, আর ঠিক তখন এশাকে দেখলাম। রাস্তা পার হচ্ছে। তার রাস্তা পার হবার টেকনিকটি চমৎকার। ডান-বাম কোনো দিকেই তাকাবে না। মাথা নিচু করে ছোট-ঘোট পা ফেলবে। ভাব দেখে মনে হবে সে অন্ধ এবং বধির। গাড়ির হর্ন, রিকশার টুনটুন কিছুই তাকে স্পর্শ করবে না। একদিন রাগ

করে বলেছিলাম, কী সব ছেলেমানুষী করা কোনো অসাবধান ড্রাইভার যদি তোমার উপর গাড়ি তুলে দেয়, তখন?

তুলবে না।

তুলবে না। এ রকম মনে করার কারণ কি?

কারণ হচ্ছে, ওরা যখন দেখবে খুবই অসাবধান একটি মেয়ে রাস্তা পার হচ্ছে, তখনি সাবধান হয়ে যাবে।

ওরা নাও তো দেখতে পারে।

উঁহু দেখবেই। কারণ আমি একজন রূপবতী মেয়ে। রূপবতী একটি মেয়েকে দেখবে না, তা কি হয়! আর যদি গাড়ি তুলেই দেয়, রাস্তায় মরে পড়ে থাকব। বিখ্যাত একজন কবি রাস্তায় মরে পড়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে একটা মিল পাওয়া যাবে।

বিখ্যাত কবিটা কে?

জীবনানন্দ দাশ।

আমি অবলীলায় বললাম, সে আবার কে? এশা আহত গলায় বলল, ঠাট্টা করছ?

না, ঠাট্টা করব কেন? নাম শুনি নি।

সত্যি নাম শোন নি?

উঁহু।

একজন শিক্ষিত ছেলে হয়ে তুমি এসব কী বলছ?

আমি শিক্ষিত—এই কথাটা তোমাকে বলল কে?

এশা ফোঁস করে বলল, আমার হাত ছাড়।

আমি হাসিমুখে বললাম, আমি তোমার হতে ধরে নেই। হাত ছাড়ার কথা উঠছে। কেন? এশা একটু যেন লজ্জা পেল। আর আমার মনটা হল খারাপ। এশা যেভাবে বলল, আমার হাত ছাড়—তা থেকে মনে হয় অনেকেই নিশ্চয়ই এশার মন খারাপ করে দেবার মতো কিছু কথাবার্তা তার হাত ধরে রেখেই বলে। তখন এশা বলে, আমার হাত ছাড়। বলতে-বলতে এটা তার অভ্যেস হয়ে গেছে।

যে-কেউ এশার হাত ধরতে পারে। এশা তাতে কিছুই মনে করে না।

জীবনানন্দ দাশের নাম আমি কেন শুনব না? আমাদের কাজই হচ্ছে বিখ্যাত লোকদের নাম শোনা। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হওয়া। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবা, আহা রে—আমি কেন এরকম হতে পারলাম না! ঈশ্বরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ যদি কখনো হয়, তাহলে অবশ্যই তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে জনাব, আপনি অল্প কিছু

মানুষকে প্রতিভা দিয়ে পাঠালেন আর আমাদের বানালেন ভেজিটেবল। এই কাজটি উচিত হল? সাম্যবাদী স্পিরিট আপনার মধ্যে কেন এল না বলুন তো?

এশাকে অবাক করে দেবার জন্যে জীবনানন্দের দুটা কবিতা মুখস্থ করে ফেললাম। তেমন কোন সুযোগ পেলে আবৃত্তি করা যাবে। তিন মাসের মধ্যে কোনো সুযোগ পাওয়া গেল না! এশার সঙ্গে বেশ কয়েক বার দেখা হল। দুবার গুলিস্তানের মোড়ে, এক বার এলিফেন্ট রোডে, বেশ কয়েক বার মধুর ক্যান্টিনে। এইসব জায়গায় নিশ্চয় বলা যায় না

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
শিয়রে বৈশাখ মেঘশাদা শাদা যেন কড়ি শঙ্খের পাহাড়
নদীর ওপার থেকে চেয়ে রবে–কোন এক শঙ্খবালিকার
ধূসর রূপের কথা মনে হবে.....

অবশ্যি একবার কবিতা শোনাবার সুযোগ তৈরি হল। এশার সঙ্গে রিকশা করে যাচ্ছি। মেঘলা দুপুর। মোটামুটি ফাঁকা রাস্তা। রিকশাওয়ালাও বুড়ো—আমাদের কথাবার্তা কিছু শুনছে বলে মনে হচ্ছে না। এশার মন খুব তরল অবস্থায় আছে বলেও মনে হল। আমি কবিতাটা মনে-মনে এক বার আবৃত্তি করে নিলাম, যাতে ঠিক সময়ে আটকে না যায়

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে
শিয়রে.....।

দ্বিতীয় লাইনে গণ্ডগোল হয়ে গেল। শিয়রে কী, তাই ভুলে গেলাম। বৈশাখ মাস, নাকি ভাদ্র মাস? মনে হচ্ছে শিয়রে খুব সম্ভবত আষাঢ় মাস। কারণ এই মাসটা নিয়েই কবিদের মাতামাতি বেশি।

এশাকে কবিতা শোনানো হল না। ভালোই হল-হয়তো সে হেসে ফেলত। তার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। মুনিরুজ্জামান নামের এক ছোকরা অধ্যাপক একবার এশাকে প্রেম নিবেদন করেছিল। গদগদ গলায় বলেছিল, এশা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

এশা তৎক্ষণাৎ বলেছে, আমিও আপনাকে ভালবাসি। কাজেই শোধবোধ হয়ে গেল। এখন আর ঐ নিয়ে কথা বলবেন না।

মুনিরুজ্জামান পরবর্তী সময়ে এশাকে নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা রটিয়েছিল। এশা তাতে খুব মজা পেয়েছে।

এত কাছ দিয়ে এশা চলে গেল, অথচ তাকে ডাকা গেল না। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। সারাদিন তাকে খুঁজছি, এখন দেখা পেলাম অথচ ডাকতে ইচ্ছা হল না। আমরা বড় অদ্ভুত প্রাণী।

বাসায় ফিরলাম পাঁচটায়।

ধীরেন কাকু বারান্দায় মুখ শুকনো করে বসে আছেন। বারান্দায় ডাক্তার বসে থাকা মানেই কিছু-একটা ঝামেলা হয়েছে। মার সেই ব্যথা কিংবা বাবার কাশি। তবে গুরুতর কিছু নয়।

সেরকম হলে ডাক্তার বারান্দায় বসে চুকচুক করে চা খেত না। ধীরেন কাকু বললেন বীরু, কোথায় ছিলে সারাদিন?

একটা ইনটারভ্যু ছিল কাকা।

তোমার বাবাও তাই বলছিলেন, এদিকে তো যমে-মানুষে টানাটানি হচ্ছিল। তোমার বাবার কথা বলছি। হঠাৎ কাশি–সেই কাশির সঙ্গে হলুদ রঙের ডিসচার্জ কিছু ব্লডও আছে।

বলেন কী?

এখন একটু ভালো, ঘুমুচ্ছেন। শোন বীরু, আমার তো মনে হয় তাঁকে হাসপাতালে ট্রান্সফার করা দরকার। তোমার চেনাজানা কেউ আছে?

জ্বি-না।

ধরাধরি ছাড়া তো কিছু হবে না। হাসপাতালের গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে দেখ। অনেক সময় টাকাপয়সা দিয়েও কাজ হয়। যাও, ভেতরে যাও। আমি আছি কিছুক্ষণ। ঘুম ভাঙুক। ভয়ের কিছু নেই।

আমি পা টিপে-টিপে ভেতরে ঢুকলাম। আমি ভেবেছিলাম মা এবং পারুল দু জনেই আমাকে দেখামাত্র মুখ কঠিন করে ফেলবে। এমন একটা ভঙ্গি করবে, যেন মহা পাষণ্ড এইমাত্র বাড়ি ফিরছে—যার বাবা মারা যাচ্ছে, অথচ এ নিয়ে যার কোনো মাথা ব্যথা নেই, বুকে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাস্তবে তা হল না। মা আমাকে দেখে অসম্ভব খুশি হয়ে গেলেন।

আনন্দে তাঁর মুখ ঝলমল করতে লাগল। এই আনন্দ ভরসা ফিরে পাওয়ার আনন্দ। আমাকে হাত ধরে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। ফিসফিস করে বললেন, এখন ভালো। খুব ভালো। ঘুমাচ্ছে।

শুরু হল কখন?

তুই যাওয়ার পরপরই। পানি খেতে চাইলেন, পানি দিলাম। পানি খাওয়া শেষ করেই কাশি। প্রথমে অল্প, তারপর চোখটোখ উল্টে যাবার মতো অবস্থা।

বল কী।

যা ভয় পেয়েছিলাম না বীরু।

ভয়ের কী আছে? মানুষের অসুখ হয় না? অসুখ হয়, চিকিৎসা করলে সুস্থ হয়। তুই যা, তোর বাবাকে দেখে আয়। শব্দ করি না, উঠে পড়বে।

আমি পা টিপে-টিপে বাবার ঘরে ঢুকলাম। গা কেমন যেন শিরশির করছে। খুব জ্বর আসবার আগে যেমন হয়, তেমন। গলা বুক শুকিয়ে কাঠ।

বাবাকে পরিষ্কার দেখা গেল না। ঘর অন্ধকার। বাবার উপর একটা মশারি ফেলে দেওয়া। মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্যে এই ব্যবস্থা। দিনের বেলা ঘুমালেও বাবা মশারি ফেলে দেন। পারুল, হাতপাখা নিয়ে মশারির ভেতর বসে আছে। ক্রমাগত হাওয়া করছে। কতক্ষণ ধরে করছে কে জানে। এ-ঘরে একটা সিলিং-ফ্যান আছে। কয়েল পুড়ে যাওয়ায় ফ্যান

ঘুরছে না। সামান্য কটা টাকা হলেই কয়েল ঠিক করা যায়। টাকাটার ব্যবস্থা বাবা সম্ভবত করে উঠতে পারছেন না। আমি পা টিপে-টিপে রান্নাঘরে চলে এলাম।

মা রান্না চাপিয়েছেন। হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। তিনি অতি দ্রুত বেগুন কুটছেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, আজ দুপুরে কারো খাওয়া হয় নি, বুঝলি। কী যে ঝামেলা গিয়েছে। মুনিরের মাকে দিয়ে একটা মুরগীর বাচ্চা আনিয়ে ছদকা দিলাম। জানের বদলে জান।

ভালো করেছ।

ডাক্তারবাবু যা করেছেন বলার না! তুই এটা খুব খেয়াল রাখবি বীরু। উনার কোনো বিপদ হলে জান দিয়ে পড়বি।

মা চোখ মুছলেন। লোকটা যা করেছে—কেউ কারো জন্যে এরকম করে না।

খারাপ ডাক্তাররা মানুষ হিসেবে ভাল হয় মা।

ছিঃ, এটা কী রকম কথা! খারাপ ডাক্তার হবে কী জন্যে?

এমনি বলছি। ঠাট্টা করছি।

এরকম ঠাট্টা আর কবি না বীরু।

আর করব না।

ডাক্তারবাবুকে এখন বল চলে যেতে। কতক্ষণ বেচারা বসে থাকবে। তার বাবার ঘুম ভাঙলে খবর দিয়ে নিয়ে আসবি।

ধীরেন কাকু ঝিমুচ্ছিলেন। আমার কথা শুনে বাসায় চলে যেতে রাজি হলেন। শুকনো গলায় বললেন, হাসপাতালের ব্যবস্থাটা কর। আমি অবস্থা ভালো দেখছি না। হার্টের বিট রেগুলার না, ইরেগুলার। মাঝে-মাঝে কেমন যেন থেমে-থেমে যাচ্ছে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত বাবা ঘুমুলেন। এই সময়টার মধ্যে আমি মার কাছে অন্য একটা খবর পেলাম।

তোর কাছে একটা মেয়ে এসেছিল রোগা-পাতলা, খুবই মিষ্টি চেহারা।

কখন এসেছিল?

তোর বাবাকে নিয়ে যখন যমে-মানুষে টানাটানি হচ্ছে তখন। কোনো কথাই বলতে পারি নি। কথা আর কি বলব বল, আমার নিজের কি তখন হুশ-জ্ঞান আছে? বাড়িওয়ালার বৌ এসেছিল, সে বলছে-আপা মাথা উত্তর-দক্ষিণ করে দিন।

মাথা উত্তর-দক্ষিণ করে দিতে হবে কেন?

মরবার সময় তাই করার নিয়ম।

এই অবস্থা হয়েছিল নাকি?

হয়েছিল।

সন্ধ্যা মিলাবার আগেই মা এবং পারুল ভাত নিয়ে বসে গেল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা অসম্ভব ক্ষুধার্ত। আমি বাবার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালাম, বাবা জেগে উঠে বললেন, কে?

বাবা, আমি। আমি বীরু।

বাতি নিভিয়ে দে।

বাতি নিভিয়ে খাটের কাছে এগুতে গিয়ে কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলাম। ঝনঝন শব্দে কী যেন নিচে পড়ল।

বাবা ভারি গলায় বললেন, কে, বীরু?

হুঁ।

ইন্টারভ্যু কেমন হয়েছে রে?

ভালো।

কী রকম ভালো?

বেশ ভালো। মনে হচ্ছে লেগে যাবে।

পেরেছিলি সব?

হ্যাঁ। দু একটা মিস হয়েছে।

আশ্চর্য মিথ্যা কথা বলতে আমার মোটেও আটকাচ্ছে না। অবলীলায় মিথ্যা বলছি। মনে হচ্ছে মাসুমের চেয়েও ভালো বলছি। মিথ্যাটাকে আমার নিজের কাছেই সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

কোনটা পারিস নি?

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর তারিখ জিজ্ঞেস করল, ঐটা পারি নি।

২২শে শ্রাবণ। পারিস নি কেন? মনে ছিল না বাবা।

খুব অন্যায়। গ্রেটম্যানদের মৃত্যুর তারিখ জন্মের তারিখ সব মুখস্থ থাকা দরকার।

অন্য সব পেরেছি। ইন্টার ববার্ডের চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করলেন মফস্বলে পোস্টিং দিলে আপনার আপত্তি আছে?

তুই কী বললি?

বললাম–না।

খুব ভালো করেছি। পোস্টিং একবার হলে ট্রান্সফার করা কঠিন না।

তা ঠিক।

বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তোর আজকের ইন্টারন্যু ভালো হবে জানতাম। সব খারাপ জিনিসের সাথে একটা ভাল জিনিস থাকে। অসুখটা যখন খুব বেড়ে গেল, তখনি বুঝলাম তোর ইন্টার ভালো হচ্ছে।

বাবা আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি পা টিপে-টিপে আমার নিজের ঘরে চলে এলাম। পারুল কিছুক্ষণ পর চা নিয়ে ঢুকল। সে খুব ভয় পেয়েছে। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে আছে। সে টেবিলে চা নামিয়ে রেখে বলল, ভাইয়া ঐ মেয়েটা বলে গেছে আজ সন্ধ্যাবেলা নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানগুলোর সামনে তুমি যেন যাও। খুব নাকি দরকার।

কী দরকার কিছু বলে নি?

না। কিন্তু ভাইয়া, তুমি ঘরে ছেড়ে যাবে না। বাবার অবস্থা খুবই খারাপ। তুমি আগে দেখ নি, তাই কিছু বুঝতে পারছ না। বুঝলে?

হ্যাঁ, বুঝলাম।

মেয়েটা কে?

আমাদের সঙ্গে পড়ে।

মেয়েটার সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারি নি। তাকে আরেক দিন আসতে বলবে?

আমি হ্যাঁ-না কিছু না-বলে শার্ট গায়ে দিলাম। পারুল তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ?

ধীরেন কাকু বলেছেন হাসপাতালে একটু খোঁজ নিতে, সিট পাওয়া যায় কি না।

পারুল আমার কথা বিশ্বাস করল না। তার চোখ দিয়ে ঘৃণা ফুটে বেরুচ্ছে। আমার ইচ্ছা করছে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিতে। কারণ আমি সত্যি-সত্যি হাসপাতালেই যাচ্ছি। যাবার আগে দু এক মিনিটের জন্যে নিউমার্কেটে হয়তো থামব। সেটা বিরাট কোনো অন্যায় নিশ্চয়ই হবে না।

টুকু লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে।

যখন কারো সঙ্গেই কথা বলতে ইচ্ছ করে না তখনই টুকুর সঙ্গে দেখা হয়। তার হাত থেকে সহজ নিস্কৃতি বলে কোন কথা নেই। গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে কথা বলবে। চলে যেতে চাইলে হাত চেপে ধরবে। পেছনে পেছনে আসবে।

টুকু সরু গলায় ডাকল, দোস্ত। আমি না শোনার ভান করলাম।

দোস্ত একটা কথা শুনে যা।

আমার কাছে টাকা-পয়সা নেইরে টুকু। দোস্ত-দোস্ত বললে কোন লাভ হবে না।

টাকাপয়সার দরকার নেই। আল্লাহর কসম। বিশ্বাস কর আমার পকেটভর্তি টাকা। দরকার হলে তুই কিছু নে সত্যি বলছি নে।

টুকু একগাদা এক শ টাকার নোট বের করল। চকচকে নোট। আমি হকচকিয়ে গেলাম।

দোস্ত তুই নে। কত লাগবে বল?

লাগবে না কিছু।

লাগবে লাগবে। চাচাজানের কথা শুনেছি। পানির মতো টাকা খরচ হবে। ডাক্তার ফাক্তার কত হাঙ্গামা। তার উপর ধর-আল্লাহু না করুক সত্যি-সত্যি যদি কিছু হয় তখন তো.....

আমি বহু কষ্টে নিজেকে সামলালাম। টুকুর উপর রাগ করা অর্থহীন। কেন রাগ করছি তা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। আমি কঠিন স্বরে বললাম, পথ ছাড় টুকু, কাজ আছে।

এক মিনিট দোস্ত। জাস্ট ওয়ান মিনিট। একটা খুবই জরুরি কথা। তোর পায়ে ধরছি দোস্ত, শুনে যা।

টুকু সত্যি-সত্যি নিচু হয়ে আমার পা চেপে ধরল।

বল কী বলবি।

টাকা কীভাবে পেয়েছি সেটা বলব।

বলার দরকার নেই। বুঝতে পারছি।

তুই যা ভাবছি, তা না দোস্ত। আপঅন গড। মজুমদার সাহেব আমাকে টাকাটা দিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলা ডাকিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর একটা খামের মধ্যে করে দিয়ে দিলেন। তিন হাজার এক শ টাকা।

কেন দিল?

সেটা বলে নি। বলেছে—টুকু, আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। আমি বললাম–দেব। তখন মজুমদার সাহেব খামটা দিলেন।

কাজটা কি?

সেটা তো দোস্ত বলে নি। পরে বলবে। অ্যাডভান্স পেমেন্ট। রাত আটটার সময়। যেতে বলেছে।

ভালোই তো, যা।

কিন্তু দোস্ত মনটা খারাপ। কী কাজ কে জানে!

মানুষ-মারা কাজ। কাউকে মেরে ফেলতে বলবে।

টুকু হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, পথ ছাড়। কাজ আছে। টাকাটা কি ফিরিয়ে দেব দোস্ত?

তোর ইচ্ছা।

ফেরত দেব কীভাবে? হাজার টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে। একটা গরম শাল কিনলাম।

ভালোই করেছিস, অস্ত্রপাতি লুকিয়ে রাখার জন্যে শাল হচ্ছে চমৎকার জিনিস।

টুকু ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলল। নিচু গলায় বলল, তুই কিছু টাকা রেখে দে দোস্ত। তোর কাছ থেকে এক টাকা দুটাকা করে মেলা নিয়েছি।

আমার লাগবে না। যাই রে টুকু।

টুকু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আসতে লাগল। সে আসবেই। রিকশায় না-ওঠা পর্যন্ত সে আসবে। রিকশায় ওঠার পরও সে অনেকক্ষণ রিকশা ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে।

দোস্ত একটা বুদ্ধি দে। কী করব যাব মজুমদারের কাছে?

টাকা নিয়েছি, যাবি না মানে? না গেলে মজুমদার তোকে ছাড়বে?

যদি সত্যি-সত্যি মানুষ মারার কথা বলে, তখন কী করব?

একটা লম্বা ছুরি সাথে করে নিয়ে যা। তোর নতুন শালের আড়ালে লুকিয়ে রাখবি। মানুষ মারার কথা বললে ছুরিটা বের করে ওর ভুড়ির মধ্যে বসিয়ে দিবি।

ঠাট্টা করছিস কেন রে দোস্ত? একটা সিরিয়াস প্রবলেম।

ঠাট্টা করছি তোকে বলল কে? ওকে মারতে পারলে তোর আগের সব পাপ কাটা যাবে।

টুকু ফ্যাকাসেভাবে হাসতে লাগল। তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম। থরথর করে ঠোঁট কাপছে। একটা হাত প্যান্টের পকেটে। এক শ টাকার চকচকে নোটগুলি সে নিশ্চয়ই এই হাতে ধরে আছে। নতুন নোটের স্পর্শের মতো আরামদায়ক আর কিছুই নেই। আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, চলি রে টুকু।

৯. নিউমার্কেটে এশার সঙ্গে দেখা হল

নিউমার্কেটে এশার সঙ্গে দেখা হল।

কী সুন্দর তাকে লাগছে! এশা হচ্ছে সেই রকম মেয়ে, যাকে যেদিন দেখা যায় সেদিনই মনে হয় সে সাজের নতুন কোনো কায়দা করেছে—যার জন্যে তাকে অন্য যেকোনো দিনের চেয়ে সুন্দর লাগছে। আজ তাকে লাগছে ইন্দ্রাণীর মতো। হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি। সেই নীলের ছায়া যেন চোখে পড়েছে। যেমন নীল-নীল লাগছে তার চোখ। সে নরম গলায় বলল, আমি ভেবেছিলাম তুমি আসতে পারবে না। তোমার বাবার শরীর কেমন?

ভালো।

সত্যি ভালোতো? আমি খুব খারাপ দেখেছিলাম।

এখন চমৎকার! খাওয়াদাওয়া করে বারান্দায় বসে আছেন।

আশ্চর্য তো!

একে বলে মিরাকুলাস রিকভারি। ধীরেনবাবু বলে আমাদের একজন ডাক্তার আছেন, তিনি যাকে বলে সাক্ষাৎ নীলরতন রায় কিংবা এই জাতীয় কিছু। এক ডোজ কী খাইয়ে দিয়েছেন-বাবা উঠে বসে বললেন, হুক্কা বোলাও।

ঠাট্টা করছ?

আরে না! বাবা অসুস্থ থাকলে আসতাম নাকি?

আমার কেন জানি মনে হয় অসুস্থ থাকলেও তুমি আসতে। পুলিশ-বক্সের সামনে যেতে বলেছিলাম। গিয়েছিলো, তাই না?

হুঁ।

তুমি যাবার কিছুক্ষণ পরই আমি গেলাম। এক পুলিশ অফিসার আমাকে খুব যত্ন করল। তোমার নাকি খুব বন্ধু।

বোসম ফ্রেন্ড। পুলিশের কোনো হেল্প লাগলে বলবে, ব্যবস্থা করে দেব। ডেকেছ কেন, ব্যাপারটা কি?

এক জায়গায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কোথায়?

বলছি। খুব তৃষ্ণা লেগেছে। দাঁড়াও, পানি খেয়ে নিই। খুব ঠাণ্ডা পানি খেতে ইচ্ছা করছে।

ঠাণ্ডা পানি এখানে পাবে কোথায়?

পাব। ওষুধের দোকানগুলোতে ফ্রিজ থাকে। ওরা ফ্রিজে ঠাণ্ডা পানি রাখে। মিষ্টি করে চাইলে দেয়।

এশা এত মিষ্টি করে পানি চাইল যে, ফার্মেসির ছেলেটি বলল, আপা বসুন, পানি দিচ্ছি।

বসব না ভাই। এক জায়গায় যেতে হবে।

এশা পানি খেল অনেক সময় নিয়ে। যেন পানি নাচা খাচ্ছে। তার কপালে খুব সূক্ষ্ম ঘাম। ঠোঁট দুটি ফ্যাকাসে। কিছু একটা নিয়ে সে মনে হচ্ছে খুব চিন্তিত।

আমি বললাম, আমরা যাব কোথায়?

মগবাজারের দিকে।

ব্যাপারটা কি?

বলব। যেতে-যেতে বলব। একটা রিকশা নাও। রোগা দেখে একজন রিকশাওয়ালা নেবে, যে খুব আস্তে আস্তে যাবে। যত দেরিতে পৌঁছানো যায় ততই ভালো। আমার ভয় করছে।

কোনো রিকশাওয়ালা মগবাজারে যেতে রাজি না। সেখানে নাকি বিরাট গণ্ডগোল হয়েছে। বাস পুড়েছে, পুলিশের জিপ পুড়েছে। দোকান ভাংচুর হয়েছে। একটা ঘড়ির দোকান লুট হয়েছে। পুলিশের গুলিতে দুজন নাকি মারা গেছে।

নির্ঘাত মাসুমের কাণ্ড। একটা কিছু সে নিশ্চয় ঘটিয়েছে। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মগবাজারে এত বড় কাণ্ড ঘটল, তার কোনো ছাপ এখানে নেই। দিব্যি দোকানপাট খোলা, ব্যবসাবাণিজ্য চলছে।

এক বুড়ো রিকশাওয়ালাকে পাওয়া গেল। সে সম্ভবত মগবাজারের গণ্ডগোলের কথা জানে না। ভাড়াও চাইছে কম। বুড়ো রিকশাওয়ালাগুলো খুব কম ভাড়া চায়। এত কষ্ট করে রিকশা টানে যে, শেষ পর্যন্ত দুটা টাকা বাড়তি দিতে হয়, তার পরেও মনে অনুশোচনা গেঁথে থাকে বুড়োলোকটাকে কষ্ট দেবার জন্যে।

এশা বলল, হুড নামিয়ে দাও। হাওয়া খেতে খেতে যাই। রিকশাওয়ালা এতই কমজোরি যে, হুড নামাতে গিয়েই পরিশ্রমে সে হাঁপাচ্ছে।

১০. কবিতার বই চলছে কেমন

আমি হালকা গলায় বললাম, তোমার কবিতার বই চলছে কেমন? এশা অবাক হয়ে বলল, কি কবিতার বই?

মাসুম বলল, কী-একটা বই নাকি বের হয়েছে? জনে-জনে সেই বই জোর করে বিক্রি করছ।

এশা তরল গলায় হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই বলল, মাসুমটা এত মিথ্যা কথা বলে কেন বল তো? তার লাভটা কী? কী আনন্দ পায়?

বই তাহলে বের হয় নি?

না। তবে একদিন নিশ্চয়ই হবে। আমার প্রথম বইটার নামও ঠিক করে রেখেছি। নাম জানতে চাও?

না।

না চাইলেও বলছি নাম হচ্ছে রজনী। নামটা কেমন?

আমি তার উত্তর না দিয়ে বললাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা বল।

বলছি। এক মিনিট লাগবে বলতে। তার আগে বল রজনী নামটা কেমন?

শরৎচন্দ্র মার্কা।

আমারও তাই মনে হয়। তবে প্রথম কবিতার নামে বইটার নাম। প্রথম কবিতাটার নাম হচ্ছে রজনী। ভরা দুপুরের রোদে হাঁটলে আমার কেন জানি মনে হয় এটা দুপুর না, গভীর রাত। কড়া রোদটাকে এক সময় মনে হয় চাঁদের আলো। ঐ নিয়ে লেখা। খুব সুন্দর হয়েছে।

সুন্দর হলে তো ভালোই।

বলব কয়েকটা লাইন? শুনবে?

না।

আহ্, শোন না! ভালো না লাগলেও তো অনেকে অনেক কিছু করে। এই যে তুমি তোমার অসুস্থ বাবাকে ফেলে আমার সঙ্গে যাচ্ছ, তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না? তবু তো তুমি যাচ্ছ। কি, যাচ্ছ না?

কোথায় যাচ্ছি সেটা বল।

এশা তা বলল না, নিচু গলায় তার রজনী কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল। তার গলা ভার-ভার হয়ে গেল। মনে হচ্ছে তার চোখে জল টলমল করছে। তার কবিতায় নিশ্চয়ই এমন কিছু দুঃখের ব্যাপার নেই। অন্য কোনো দুঃখের কান্না সে এই কবিতা বলার ফাঁকে কেঁদে নিচ্ছে।

আমি এশার হাতে হাত রাখলাম। অনেক দিন পরপর এশার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার হাতে হাত রাখার মতো সুযোগ প্রায় কখনোই হয় না।

এশা কবিতা আবৃত্তি থামিয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, মানুষ হিসেবে তুমি বেশ অদ্ভুত। এতক্ষণ পর তুমি আমার হাতে হাত রাখলে? তাও ধরলে বাঁ হাত।

আমি চমকে হাত সরিয়ে নিলাম। এশা ফিসফিস করে বলল, হাত সরিয়ে নিও না। আমি জানি আজই শেষ। আর কোনোদিন তুমি আমার হাতে হাত রাখবে না। পাশাপাশি হাঁটবে না।

এর মানে কি?

মানে কিছু নেই। এমনি বললাম। আমরা এসে গেছি। রিকশা ছেড়ে দাও। এখান থেকে হেঁটে হেঁটে যাব।

স্ট্রিট-লাইট নেই। রাস্তাঘাট গণ্ডগোলের জন্যেই হয়তো অতিরিক্ত ফাঁকা। আমার নিজেরই ভয়ভয় লাগছে, এশার কেমন লাগছে কে জানে। তার ভাবভঙ্গিতে কিছু প্রকাশ পাচ্ছে না। আমরা মূল রাস্তা ছেড়ে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়লাম। এশা আমার হাত ধরে ছোট-ঘোট পা ফেলছে। এক সময় সে থমকে দাঁড়িয়ে বলল, আমার জীবনটা খুব কষ্টে-কষ্টে কেটেছে। ছোটবেলায় বাবা মরে গিয়েছিলেন। মা আবার বিয়ে করলেন। মার সঙ্গে নতুন সংসারে চলে এলাম। অচেনা-অজানা একজন নির্বোধ মানুষকে বাবা ডাকতে লাগলাম। নতুন সংসারে তিনটা ভাইবোনের জন্মের পর মা মারা গেলেন। আমার অবস্থাটা চিন্তা করে দেখ। এমন একটা সংসারে বড় হচ্ছি, যার সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। বুঝলে

বীরু, খুব ছোটবেলা থেকেই আমি স্বাধীনভাবে বড় হতে চেয়েছি। নিজেকে অন্যরকম করতে চেয়েছি। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে আলাদা, এটা আমি কখনো মেনে নিতে চাই নি। সহজভাবে মিশি ছেলেদের সঙ্গে। চমৎকার কিছু ছেলেদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, সেই সঙ্গে কিছু আজেবাজে ধরনের ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

এশা চুপ করল। বড় করে শ্বাস টানল। আমার যে-হাত এতক্ষণ ধরে ছিল, সেই হাত ছেড়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, আমার পেটে একটা বাচ্চা আছে। তাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। আমার একা খুব ভয় লাগছে। তুমি অল্প কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাক। যদি মরেটরে যাই তুমি বাসায় খবর দিও। এই জন্যেই তোমাকে এনেছি।

এখা কথাগুলো বলল খুব সহজ ভঙ্গিতে। যেন খুবই সাধারণ একটা খবর দিচ্ছে। কথা শেষ করে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। গাঢ় বেদনার কোনো ছায়া সে নিঃশ্বাসে নেই।

১১. দাঁড়িয়ে আছি একটা ক্লিনিকের সামনে

আমরা দাঁড়িয়ে আছি একটা ক্লিনিকের সামনে। এশা আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। এক সময় কালো মোটা একজন নার্স এসে আমাকে বলল, আমাদের ওয়েটিং রুম আছে। আপনি ভেতরে এসে বসুন। সময় লাগবে।

আমি রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে রইলাম। রাত এগারটায় এক জন ডাক্তার এসে। বললেন, আপনি এখন চলে যেতে পারেন। রুগী ভালো আছে, ঘুমুচ্ছে। আজ রাতটা এখানে থাকতে হবে।

আমি বললাম, রুগীকে কি একটু দেখতে পারি?

হ্যাঁ, পারেন। আসুন আমার সঙ্গে।

এশা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। কম পাওয়ারের একটা টেবিল ল্যাম্প তার মাথার কাছে। সেই আশোয় কী সুন্দরই না তাকে দেখাচ্ছে। মাথার পাশের জানালাটা খোলা। সাদা পর্দা থরথর করে কাঁপছে। জানালার ওপাশে বিপুল অন্ধকার।

আমি নিচু হয়ে এশার হাত স্পর্শ করলাম। আমি কোনো দিন এশার হাতে হাত রাখব না, এশা এই কথাটি ঠিক বলে নি। আমি আবার তাকে ছুঁয়েছি।

নার্স অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখছে। আমি বললাম, সিস্টার, আমি কি এখানে কিছুক্ষণ বসতে পারি?

১২. চুপচাপ বসে আছি

আমি চুপচাপ বসে আছি। আকাশে মেঘ ডাকছে। জানালার পর্দা কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টির ফোটা পড়তে শুরু করেছে। নিশ্চয়ই আজ সারা রাত প্রবল বর্ষণ হবে। আমি বসেই আছি। রাত বাড়ছে। আমি অপেক্ষা করছি। কিসের অপেক্ষা? আমি জানি না।

মানুষ হয়ে জন্মানোর সবচে বড় কষ্ট হচ্ছে মাঝে-মাঝে তার সবকিছু পেছনে ফেলে চলে যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু সে যেতে পারে না। তাকে অপেক্ষা করতে হয়। কিসের অপেক্ষা তাও সে ভালোমতো জানে না।